সরোজ-বাসিনী।

(উপন্যাস।)

শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রণীত এবং প্রকাশিত।

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

"অযুক্তং যদিহ প্রোক্তং প্রমাদেন ভ্রমেণ বা।
কৃপয়াচ দয়াবন্তঃ সন্তঃ সংশোধয়ন্তু তৎ॥"

কলিকাতা;
৭৫ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট—বাঙ্গালা যন্ত্রে
শ্রীহরিচরণ আচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৩।

উৎসর্গ পত্র।

মহিমার্ণবোপমা দীনজন প্রতিপালিকা পুটিয়াধিশ্বরী

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী

সতীকুল-গৌরববর্দ্ধিনীষু।

জননি!

আপনি, রমণী কুলের শিরোমণি, সাক্ষাৎ কমলা; কুলবালাগণকে পতিব্রতাধর্ম্মে সুশিক্ষিতা করিবার জন্যই নরলোকে শরৎসুন্দরী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আপনার সতীত্ব রূপ শ্বেত পদ্মের সৌরভে জগৎ সুবাসিত; আপনার, পতিব্রতা-ধর্ম্ম-পালন জনিত নির্ম্মল যশশ্চন্দ্রের বিমল কিরণ, কলঙ্কী শশীর কিরণ মালাকে সমল করিয়া তুলিয়াছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার চরিত্র নারীকুলের আদর্শ স্বরূপ হউক। মাতঃ! আমি আপনার সুচারু চরিত্রে পরম প্রীত হইয়া, সামান্য বসন ভূষণে অলঙ্কৃত আমার সরোজবাসিনীকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া দিলাম। যদিও সরোজ, আমার দোষে, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে শরীর সাজাইতে বঞ্চিত; তথাচ বলিতে পারি, সরোজের পবিত্র স্বভাবে আপনি প্রীতি লাভে সমর্থ হইবেন। এই গ্রহণ করুন আমার আদরিণী সরোজ-বাসিনীকে আপনার কমল-করে সমর্পণ করিয়া সুস্থির হই, বিস্তরেণালং।

প্রণত

শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন।

এই বর্ত্তমান সময়ে অসংখ্য কৃতবিদ্য ও অনেকানেক, সুবিজ্ঞ সুকবি মহাশয়দিগের সমক্ষে কি জন্য যে সরোজবাসিনীকে বাহির করিলাম তাহা আমি জানি না। ইহা দ্বারা জনসমাজের কিয়ৎ পরিমাণেও উপকার সাধিত হইবে কিনা, তাহাও আমি জানি না। সরোজবাসিনী অপেক্ষা কতশত গুণে উৎকৃষ্ট এবং বসন ভূষণে সুশোভিত কতশত কামিনী এই ভারতে পাঠক মহাশয়গণের গৃহেগৃহে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়াও যে সরোজকে বাহির করিলাম, সেইটিই আমার মহদ্দোষ; আর এক চিন্তার বিষয় এই, পাছে পাঠক মহাশয়গণের বহুমূল্য সময়, অন্যায় রূপে ব্যয়িত হয়। নূতন উপন্যাস রচনা করিয়া, সকলকে সন্তুষ্ট করত কবি হইয়া যশোলাভ করিব, সে আশা আমি স্বপ্নেও করি না। তবে যদি সরোজের দ্বারা সমাজের কোন উপকার সাধিত হয়, তজ্জন্য যে পুণ্য বা পুরস্কার তাহা আমার বন্ধুবর্গের থাকিল। আর যদি অপকার ঘটে তবে তন্নিমিত্ত যে পাপ বা তিরস্কার সে আমার থাকিল; কারণ, আমি আমার বন্ধুবর্গের আগ্রহ এবং অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়াই যে একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ইহা অনেক পরিমাণে "জানি না" কথার শেষ উত্তর বলিলেও বলা যায়। পরিশেষে বিনয় বচনে প্রার্থনা এই, প্রমাদ বশতঃ মধ্যে মধ্যে কয়েকটি অশুদ্ধ রহিয়া গিয়াছে, সুধীগণ নিজ উদারতা গুণে সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। যদি কখন পুনরঙ্কন ঘটে সংশোধন করিয়া দিব, নচেৎ আর আমার কোন কষ্টই পাইতে হইবে না নিবেদন ইতি

পরিশেষ ইলছোবা স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ সরকার, ড্রইং মাষ্টার বাবু তুলসীদাস পাল, কলিকাতা গডেলের প্রথম পণ্ডিত প্রিয় বান্ধব জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার রাধানাথ সিংহ, কবিরাজ যোগীন্দ্রচন্দ্র সেন মল্লিক, বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস এবং অন্যান্য বন্ধুগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় লইলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমার লেখনী দ্বারা আপনাদিগের নাম নিষ্প্রভ না হউক অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা।
১৯ এ চৈত্র,
১২৮৯ সাল।

পণ্ডিত
শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য।
গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালা।

সরোজ-বাসিনী।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নবীন সন্ন্যাসিনী।

জ্যৈষ্ঠ মাস ভয়ানক গ্রীষ্ম, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মস্তকোপরি আরোহণ করিয়া, আপনার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতেছেন। কিরণ-জালে জগৎ-দগ্ধ করিতেছেন। পথে পাদ-বিক্ষেপ করে কাহার সাধ্য; বালুকা উত্তপ্ত, এবং কঙ্করসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় হইয়াছে। চতুর্দ্দিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পবনদেব, অঙ্গে অনলরাশি বর্ষণ করিতেছেন। মায়াবিনী মরীচিকা স্থানে স্থানে আপনার মায়াজাল বিস্তার করিতেছে। খাল, বিল, সরোবর সকল শুষ্ক-প্রায় হইয়াছে। কোন কোন স্থান একবারেই জলশূন্য; বৃক্ষাদি

---

* "কনক-নলিনী" এবং "সরোজ বাসিনী" এই দুই ভগিনীর মধ্যে আপাততঃ "সরোজবাসিনী"ই পাঠক মহাশয়গণের সন্তোষ সাধন করিবেন। এই দুই ভগিনীই রমণীগণকে পতিব্রতা ধর্ম্মে সুশিক্ষিতা করিতে বিশেষ পারদর্শিনী; ভরসা করি, ইহা দ্বারা, নর, নারী উভয়েই অমৃত ফল লাভে সমর্থ হইবেন।

শ্রীব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থকার।

বিরহিত বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তর সকল ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। অনাবৃত স্থানে আর প্রাণীমাত্রকেও দেখা যায় না। সকলেই প্রবল গ্রীষ্মে বিশেষ কাতর, ঘর্ম্মাক্তকলেবর; গৃহ উষ্ণ, বায়ু উষ্ণ, নিশ্বাস উষ্ণ, শীতল হইবার উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে শুষ্ক পর্ণের মর্ মর্ শব্দ, জীবগণের কাতর ধ্বনি, চাতকের বিনয়-ভিক্ষা, ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই শুনা যায় না। অধিক কি চতুর্দ্দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন সমস্ত পৃথিবীতে অগ্নি লাগিয়াছে। পুত্র-গণ দুঃখে, পৃথিবী-হৃদয় স্থানে স্থানে ভয়ানক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে!

এই ভয়ানক সময়ে জনশূন্য সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যস্থ এক বট-বৃক্ষ-মূলে, সরোজবাসিনী উপবিষ্টা; এমন সময়ে এইস্থানে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্ দেবতারাও আসিতে ভীত হয়েন। এমন স্থানে সরোজবাসিনী উপবিষ্টা, একাকিনী ষোড়শী রমণী উপবিষ্টা, বাম-করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া উপবিষ্টা; মানস-সরসের কনক-কমল-সদৃশ-বদন খানি—আজি ম্লান; বিশুষ্ক এবং গ্রীবা-রূপ-মৃণাল হইতে আবক্রভাবে অবস্থিত। আকর্ণ-বিশ্রান্ত চঞ্চল আয়ত-নয়ন—আজি স্থির। জানি না কি জন্য—সেই তরল, অমৃতময়, মাধুর্য্যময়, প্রেমময় নয়নদ্বয় হইতে অজস্র অশ্রুজল বিগলিত হইয়া, গণ্ডদ্বয়, করতল এবং বামাঙ্গ অভিষিক্ত করিতেছে। ত্রিভুবন-বিজয়ী-রতিপতির শরাসন-বিনিন্দিত ভ্রূযুগল এবং ললাট ফলক মধ্যে মধ্যে এক একবার আকুঞ্চিত হইতেছে। ঈষৎ প্রশস্ত-ললাট-ফলকে এবং মুখকান্তিতে যেন চিন্তাদেবী, মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সূর্য্য-কিরণে-বিশুষ্ক আলোহিত অধরোষ্ঠের রক্তিমা অন্তর্হিত না হইয়া যেন প্রগাঢ় হইয়াছে। সুদীর্ঘ অরাল-কেশ-দাম, বায়ু-ভঙ্গ-জলদাবলীর ন্যায় রীতিবিরহিত হইয়া মুখে, অংসে, ও পৃষ্ঠদেশে পতিত হইয়াছে। এ দারুণ গ্রীষ্মেও সুগঠন, সুগোল, সুকোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মনোহর শোভা, শোভা হীন হয় নাই।

প্রবর্দ্ধিত, ঘন, কঠিন, পীনোন্নত কুচযুগল, আবক্রভাবে একের উপর অন্য সংযুক্ত হইয়া পরস্পর সংঘর্ষিত হইতেছে। বিলাসীর কথা দূরে থাকুক্ মুনিজন বাঞ্ছিত প্রশস্ত নিতম্বদেশ, আজি অঙ্ক-আসনের পরিবর্ত্তে পত্রাসন আশ্রয় করিয়াছে। অলৌকিক রূপরাশি, সূর্য্য-কিরণে শ্রীহীন হওয়া দূরে থাকুক্ বরং শ্রীবৃদ্ধিই করিয়াছে। সরোজ-বাসিনি! আপনি কি মানবী-সরোজবাসিনী; না—কমলা-দেবী; নারায়ণের প্রতি অভিমানিনী হইয়া বৈকুণ্ঠধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ বিজন প্রান্তরে আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছেন?

শোভনে! অতো ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস কেন? অধরোষ্ঠের বিস্ফুরণ কেন? আয়তনয়নে জল কেন? এ জনশূন্য স্থানে এ অবস্থায় একাকিনী কেন? আপনি যে মূর্ত্তিমতী কমলা, সাক্ষাৎ সতীর অবতার, আপনার সতীত্ব সৌরভে যে দশদিক্ সুবাসিত, আপনি যে অনাঘ্রাত নববিকশিত শ্বেতপদ্ম; আপনি যে সীমন্তিনীকুল-কনক-নলিনী, আপনার এ অবস্থা কেন।

নবীন সন্ন্যাসিনী আজি স্বামিকৃত অপমানে, অপমানিতা; স্বামী সোহাগের অভাবে পাগলিনী, স্বামী পরিত্যক্তা এই বিষাদেই বিষাদিনী, স্বামী বিহীন যৌবনে ফল কি এই চিন্তাতেই চিন্তাকুলা, স্বামি-শূন্য গৃহ বনস্থলী এই নিমিত্তই বিবাগিনী; অতো দীর্ঘ নিশ্বাস কিসের? স্বামী পারদারিক!—স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ কুল-কামিনীর পক্ষে ইহা অসহনীয়; কুলটার অনুরোধে স্ত্রী পরিত্যাগ—একান্ত অসহনীয়; আবার তাহার উপর কটূবাক্য নিতান্ত অসহনীয় —ইহা সতী পতিব্রতা সীমন্তিনীর পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়;——

ক্রমে চিন্তা, উদ্বেগ ও যন্ত্রণায় শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা, সতী পতিব্রতার অসহ্য কষ্টে ক্লিষ্ট হইয়াই যেন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিলেন। সরোজবাসিনী ধরাসনে পতিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। সময় চলিয়া গেল। নিদ্রা ভঙ্গে

দেখেন—রৌদ্রের উত্তাপ অনেক কমিয়াছে। উত্থিত হইলেন। অঙ্গে অনেকগুলি অলঙ্কার ছিল—উন্মোচন করিলেন। বস্ত্রে বন্ধন করিলেন। পরে এক গ্রাম লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে চলিলেন।

সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সরোজবাসিনী গ্রামে প্রবিষ্টা হইয়া কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, কোথায় অবস্থান করিয়া নিরাপদে রজনী যাপন করিতে পারিবেন, এই চিন্তাতেই চিন্তাকুলা হইলেন। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া এক কৃষকের শস্যগৃহে গুপ্তভাবে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে কিছু দিন পরে এক অশীতিবর্ষ-বয়স্কা উদাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সরোজবাসিনীর দুঃখে দুঃখিতা হইয়া তাঁহাকে পরম যত্নে আপনার আশ্রমে রাখিলেন, এবং যোগ শিক্ষা দিয়া কথঞ্চিৎ তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলেন। সরোজবাসিনী বারানসী শাটী পরিত্যাগ করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন। সুগন্ধি দ্রব্যের পরিবর্ত্তে পরম সমাদরে ভস্মরাশি সর্ব্বাঙ্গে বিলেপন করিলেন। আলুলায়িত কেশদাম ভস্মাচ্ছাদিত হইল। রুদ্রাক্ষের মালা; ভূষণ স্থান অধিকার করিল। কেবল লৌহ নির্ম্মিত লৌহ, বাম করে অবস্থিত হইয়া পতির মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করাইতে লাগিল। সরোজবাসিনীর সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা, দক্ষিণ করে জপ মালা, বাম করে ত্রিশূল তাহাতে প্রলম্বিত ভিক্ষার ঝুলি, তন্মধ্যে পূর্ব্বোন্মুক্ত ভূষণরাশি; তাহা এই অভিপ্রায়ে রাখিয়াছেন—তদ্দ্বারা কোন পতিপ্রাণা সরলা কামিনীকে সাজাইয়া মনের দুঃখ নিবারণ করিবেন।

পাঠক একবার পূর্ণযৌবনে পরিশোভিতা সরোজবাসিনীর সন্যাসিনীর বেশ দর্শন করিয়া অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়রসে অভিষিক্ত হউন।

কোথায় যৌবনোচিত বিলাস ব্যাপার, কোথায় কঠোর তাপস ব্রত; কোথায় সুখসেব্য স্রবাসমূহের ভোগাভিলাষ, কোথায় ফল মূল পাদপ-পত্রে জীবন ধারণ; কোথায় বিবিধ বিলাস দ্রব্যে সুসজ্জিত শয়ন-ভবন, কোথায় নানাবিধ বিপদসঙ্কুল তরুমূল; কোথায় সুবাসিত সুশীতল পানীয়, কোথায় গলিত পত্র কষায়িত পল্বল বারি; কোথায় সখীগণের সুমধুর প্রিয় সম্ভাষণ, কোথায় আরণ্য জীবগণের ভয়ানক কঠোর ধ্বনি; এ সকল চিন্তা করিয়া হৃদয় একেবারে অভূতপূর্ব্ব ভাব পরম্পরায় বিমোহিত হয়।

সরোজবাসিনীর এ অবস্থার কারণ, তাঁহার পতি কমলাকান্ত। এ যৌবনে কমলাকান্তই তাঁহাকে সন্ন্যাসিনী করিয়াছেন। পারদারিক কমলাকান্তই তাঁহাকে অকুল সমুদ্রে ভাসাইয়াছেন। স্বর্গীয় দেব-দুর্ল্লভ মন্দার কুসুমের মহিমা পরিজ্ঞানে মূর্খতম কমলাকান্তই তাঁহাকে এই অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছেন।

সরোজবাসিনী কিছু দিন বৃদ্ধার আশ্রমে থাকিয়া তৎপরে উপ-যুক্ত সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজয়পুর।

এই রত্ন প্রসূ ভারতভূমির অন্তঃপাতী এক রাজ্য আছে। বিজয়-পুর তাঁহার রাজধানী; অরিন্দম নামে এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাত্মা এই রাজ্যের রাজা; ইনি দানে কর্ণের, ধর্ম্মে যুধিষ্ঠিরের, বীর্য্যে ভার্গবের, প্রজা পালনে রামের এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীর সমান। ইহাঁর বিনয় নামে এক পুত্র ও রত্নমালা নামে এক কন্যা আছেন।

বিনয় সাক্ষাৎ বিনয়ের অবতার। রত্নমালা মূর্ত্তিমতী কমলা। মুরলা নাম্নী কামিনী বিনয়ের সহধর্ম্মিণী এবং রত্নমালার প্রিয় সঙ্গিনী; সমান বয়ঃনিবন্ধন উভয়ের এক মন এক প্রাণ, কেবল শরীর মাত্র ভিন্ন। ধারা রাজ্যাধিপতি মহারাজ রুদ্রদেবের বংশধর সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সর্ব্বলোকরঞ্জন সুকুমার কুমার হংসকেতু, রত্নমালার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের সরোজবাসিনী, বিজয়পুরবাসী ভৈরব শর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা এবং রত্নমালার প্রিয় সঙ্গিনী। ভৈরব শর্ম্মার রাজবাটীতে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। মহারাজ অরিন্দম তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীপুরনিবাসী কমলাকান্তের সহিত সরোজবাসিনীর বিবাহকালে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজকুমারী রত্নমালা, সরোজবাসিনীকে এক সাজ অলঙ্কার প্রদান করিয়া, স্বহস্তে বেশবিন্যাস করিয়া দিয়াছিলেন। রাজবাটীর পার্শ্বেই ভৈরব শর্ম্মার বাসভবন, তন্নিবন্ধন সরোজবাসিনী সর্ব্বদাই মুরলা এবং রত্নমালার সহবাসে কাল হরণ করিতেন। রত্নমালা বিংশতি বর্ষবয়স্কা, মুরলার অষ্টাদশ এবং সরোজবাসিনী ষোড়শ বর্ষে অবস্থিতা। অল্প বয়সেই রত্নমালা এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন—নাম নগেন্দ্র; এই প্রবন্ধের সহিত ইহাঁদিগের বিশেষ সম্বন্ধ আছে—এজন্য পাঠক মহাশয়কে ধৈর্য্য ধরিয়া সকল কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

বারনারী।

শ্রীপুরনিবাসী কমলাকান্ত এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের পুত্র, ইহাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতে কমলাকান্তকে দাসত্ব করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় না। সুখ সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

হইয়া থাকে। কমলাকান্ত নিজে মূর্খ নহেন বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং ইংরাজিতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি। ইহাঁর পূর্ব্বে চরিত্র যাহা জানা যায় তাহাতে ইনি পরোপকারী, শান্ত, সুবুদ্ধি এবং দয়ালু; শরচ্চন্দ্র এবং সুরেন্দ্র নামে ইহাঁর দুইটী সহাধ্যায়ী হতেই ইহাঁর এই অভূতপূর্ব্ব মতি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। শরচ্চন্দ্র ভয়ানক সুরাপায়ী, লম্পট, শঠ, প্রবঞ্চক; সুরেন্দ্রও শরচ্চন্দ্রের অনুরূপ। শরচ্চন্দ্রের স্ত্রীর নাম শৈলবালা; সুরেন্দ্রের বিবাহ হয় নাই—পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধ মাতা এবং ইন্দুমতী নাম্নী এক অল্প বয়স্কা বিধবা ভগিনী।

যেমন পূর্ণচন্দ্র ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ঘোর অন্ধকারে আবৃত হয়। সেইরূপ অসৎ সহবাসে কমলাকান্তের অন্তঃকরণ দুষ্প্রবৃত্তিরূপ তামসীজালে আবৃত হইল এবং সদ্‌গুণ সকল অন্তর্হিত হইয়া গেল।

শ্রীপুরে কুসুমকুমারী নামে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এক বারনারী বাস করিত। সহবাস গুণে কমলাকান্ত তাঁহার প্রণয়ে পড়িলেন এবং রূপশোভায় বিমোহিত হইলেন।

এক দিবস কমলাকান্ত, কুসুমকুমারীর গৃহে আগমন করিয়া একাসনে বসিয়া উভয়ে মদ্যপান করিতে লাগিলেন। ক্রমে মত্ততা প্রকাশ পাইলে সময় বুঝিয়া বারনারী কমলাকান্তকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিমোহন নয়ন ভঙ্গির সহিত কটাক্ষশরে বিদ্ধ করত কহিল, কমল! তুমি কাহাকে অধিক ভাল বাস? কমল কহিলেন, তোমাকে; কুসুম কহিল, না তাহা কখন না, ইহা তোমার মন রাখা কথা। কমলাকান্ত কহিলেন, কেমন করিয়া জানিলে আমি তোমাকে মৌখিক কথায় সন্তুষ্ট করিয়া থাকি? কুসুম কহিল—আমার প্রতি তোমার আর পূর্ব্বের সে ভাব নাই—তোমার মন কেমন কেমন হইয়াছে। আমার গৃহ সাজাইতে যত্ন নাই, আমার বস্ত্রালঙ্কারেও কথা নাই—আমি তোমার কাছে থাকিয়া চিরকাল কাঙ্গালিনীর বেশে কাটাইব, যৌবন গেলে

আমার কি উপায় হইবে? তুই শঠ—আমি শুনিয়াছি—তোর স্ত্রী অতি সুন্দরী—তাহার যৌবনকালও হইয়াছে। তুই না তাহাকে গৃহে আনিবার উদ্যোগে আছিস্।—ইহা বলিয়া বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া অঙ্কে শয়ন করাইল, পুনর্ব্বার সবলে আলিঙ্গন করিল এবং কহিল, ইহা যদি সত্য হয় তবে আজি আমার একটী উপায় করিয়া দিয়া আমার ঘর হইতে দূর হ—। পুরুষ জাতি অতি শঠ—আমি সেই সময়েই বলিয়াছিলাম—কমল! তুই আমাকে ছাড়্ আমার জন্য অনেকে লালায়িত। আমাকে রাখা তোর কর্ম্ম নয়। তখন আপাত মধুর মোহন-বাক্যে আমাকে প্রতারিত করিয়া যাহা বলিয়াছিলি, সে সকল এখন কোথায় গেল। ধূর্ত্ত—আজি আমি তোকে মারিয়া ফেলিব। ইহা বলিয়া প্রণয় প্রহার করিয়া পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিল। কমল গলিয়া গেলেন। কহিলেন কুসুম! আমি তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকে জানি না।—আমি শয়নে স্বপ্নে তোমার মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া থাকি। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি—যাহাতে তোমার ভাল হয় তাহা করিব। অধিক কি তোমার জন্য যদি স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিব। কুসুম সময় বুঝিয়া কহিল—করিবি, করিব, করিবি, করিব, করিবি, করিব; দেখ তিন সত্য করিলে—ইহার পর অধর্ম্ম কর নরকে পড়িবে। হাসিয়া আবার আলিঙ্গন করিল। কমল জ্ঞান হারাইলেন—পরক্ষণে কহিলেন—কুসুম আমি মনে করিয়াছিলাম সরোজকে গৃহে আনিয়া রাখিব; আর তাহা হইল না; অদ্য হইতে তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি বহু পুণ্য ফলে তোমাকে লাভ করিয়াছি। তোমাকে ক্ষণকাল না দেখিয়া প্রাণ কেমন করে। তুমি আমার হৃদয়হারিণী—আমার যাহা কিছু আছে অদ্য হইতে তাহা তোমার হইবে। কুসুমের আনন্দের সীমা রহিল না—হাসিয়া কহিল—কাল আমাকে হীরের বালা দিবি—দেবো; সরোজকে ত্যাগ করিলি—করিনু। আচ্ছা তবে আয়—একবার বুকে রাখিয়া হৃদয়

শীতল করি—পুনর্ব্বার সবলে আলিঙ্গন করিল। মায়াবিনী-রাক্ষসীর মায়া-প্রভাবে কমল জ্ঞান হারাইলেন, ধর্ম্মপথে কণ্টক দিলেন, এবং পরকালের নিমিত্ত রৌরব নরক সঞ্চয় করিলেন। চিরকালের জন্য দুর্মোচ্য কলঙ্কে পতিত হইলেন।

হায়! এইরূপ দুর্ব্যবহারে ভারত উৎসন্ন হইল। আর উন্নতির আশা নাই। সুপবিত্র ভারতমাতার গর্ভে এই দুরাচার নরাধমেরা জন্ম গ্রহণ করিয়া জননীর সর্ব্বনাশ করিল। হে লম্পটকুল! তোমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানে ধিক্, তোমাদের সভ্যতাকেও ধিক্, তোমাদের আচার ব্যবহারেও ধিক্ এবং তোমাদের জন্মেও ধিক্। তোমরা দ্বিপদ-পশুরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভারতের কি সর্ব্বনাশই না করিতেছ। তোমাদের কথা মনে হইলে ঘৃণার উদয় হয়। তোমাদের অকার্য্য কিছুই নাই। যে ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া নরকের পূর্ণামূর্ত্তি বারনারীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়, যে স্বর্গভূমি ছাড়িয়া নরকে আবাস নির্ম্মাণ করে। যে সুধা ছাড়িয়া, হলাহল ভক্ষণ করে। যে দেবী-সেবা পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসীর উপাসনা করে। যে ধর্ম্মপত্নীর নয়ন-নীরে বারনারীর পাদ ধৌত করে। যে সুশীতল সলিল পরিত্যাগ করিয়া শীতল হইবার বাসনায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে। যে জননীর সঞ্চিত অর্থ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা গণিকার উদর পোষণ করে! যে পরম পূজ্য পিতা মহাশয়ের হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিয়া নিজ কামাচারিতা চরিতার্থ করে। সেই নরাধমের নাম কীর্ত্তনেও প্রভূত পাপরাশির সঞ্চয় হয়।

পারদারিক! তুমিই এই সমস্ত মহাপাপে ঘোর পাপী; তোমার ছায়াস্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

হে পারদারিক! তুমি একবার আমার সহিত আগমন কর। আমি দুরাচার লম্পটগণের ভবনে ভবনে ভ্রমণ করিয়া তাহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণের হৃদয় বিদারিণী অবস্থা পরম্পরা দর্শন করাইয়া দিই।

ঐ দেখ সতী পতিব্রতা, প্রিয়-পতির চরণ দর্শন-লালসায় বিবিধ বিলাস দ্রব্যে বাসগৃহ সুসজ্জিত করিয়া প্রতিক্ষণেই পতির আগমন পথ, প্রতীক্ষা করিতেছেন। নিঃশব্দে প্রদীপ জ্বলিতেছে। যামিনী চুপে চুপে প্রস্থান করিতেছে। হৃদয়েশ এই আসেন, প্রাণপতি এই আসেন, এই করিতে করিতেই যামিনী প্রভাতকল্পা। এদিগে পামর, উপপত্নী ক্রোড়ে নিদ্রিত। ঐ দেখ হতভাগিনী প্রত্যূষ দর্শনে অজস্র-নয়ন-নীর বিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়াগ্নি নির্ব্বাণের বৃথা চেষ্টা দেখিতেছেন। পারদারিক! অন্যত্র ঐ দেখ দেখ বিদ্যুৎবরণী ষোড়শী রমণী, গলদেশে বসনাঞ্চল প্রদান পূর্ব্বক কোমল করে পতির পদ-যুগল ধারণ করিয়া, স্বামিন্! হৃদয়েশ! এ দাসীর বিনয় ভিক্ষা-এই—দয়া করিয়া অদ্য রজনী, সেবিকার গৃহে অবস্থান করুন। আমি এক রাত্রি মনের সাধে চরণ সেবা করিয়া নারী জন্ম সার্থক করি। নাথ! আমি ঋতুস্নাতা, এজন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রার্থনা এই, চরণোপান্তে স্থানার্পণ করিয়া কৃতার্থ করুন। পামর! দেখ দেখ ঐ তোমার সহচর, বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় কটুবাক্যে ঋতুস্নাতা রমণীকে নয়ন-নীরে ভাসাইয়া উপপত্নী গৃহে গমন করিতেছে। উপপত্নী-সেবিন্! ঐ অন্য গৃহে দর্শন কর, নরাধম বেশ্যাসেবী পিশাচ, কনক-কমলিনীকে চরণ-দলিত করিয়া কোমল অঙ্গের অলঙ্কার সকল অপহরণ পূর্ব্বক উপপত্নীকে সাজাইবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে গমন করিতেছে। আর সরলা বালা, নয়ন-জলে ধরাতল প্লাবিত করিতেছেন। দুরাচার! আবার ঐ দর্শন কর, বেশ্যাপদসেবী পামরগণের কাঙ্গালিনী সহধর্ম্মিণী-সকল অসহ্য বিরহ যন্ত্রণায় জ্বালাতন হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছেন; অপরা বিষ ভক্ষণ করিতেছেন, ঐ জলমজ্জন ব্যাপার দর্শন কর।

গণিকাবল্লভ! লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, দুঃখে অন্তঃকরণ জ্বলিয়া উঠে—ঐ দেখ, যেমন একদিকে তুমি, বেশ্যাসক্ত হইয়া আপনার নির্ম্মল

চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া প্রভূত পাপরাশি সঞ্চয় করিতেছ। অন্য দিকে তেমনই তোমার বনিতা তোমার আশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার অমূল্য সতীত্বধন ভৃত্য বা তাদৃশ অন্য ব্যক্তিকে প্রদানপূর্ব্বক তোমার সেই পাপরাশিকে বর্দ্ধিতই করিতেছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন রমণী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারা তোমাদের কৃতকার্য্যের প্রতিফল তোমাদিগকেই ভোগ করাইতেছেন। আর কেন, মোহনিদ্রা ত্যাগ কর। পবিত্র হইতে যত্নবান হও। গণিকা-ভোগ-বাসনা হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া দাও। যে মোহান্ধ ব্যক্তি, বেশ্যার আপাত মনোহররূপে বিমুগ্ধ হয়, সে অতি নির্ব্বোধ; গণিকার রূপ-পাপাগ্নি দৃষ্টি-বিষাক্ত বিশিখ; হাস্য—নরক প্রতিভা; বাহুযুগল-বিষবল্লরী; বিনানবেণী-কালসর্পী; কুচযুগল—বিষকুম্ভ; মুখবিবর—রৌরব কুণ্ড, অথবা চার, ভট, চৌর চেটক, নট, বিটদিগের পিকদানি স্বরূপ। আলিঙ্গন—মৃত্যু। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি বেশ্যামুখে মুখার্পণ করিয়া চুম্বন করে, সে রৌরব নরককুণ্ড হইতে পূর্ণগ্রাসে বিষ্ঠা ভক্ষণ করে এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সতী পতিব্রতার অধরেই সুধা থাকে, অপবিত্রা বেশ্যার অধরে তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। জগতে যত কিছু পাপাচার, বীভৎসকার্য্য, অশ্রদ্ধেয়—ন্যক্কারজনক ব্যাপার আছে, বেশ্যা সেই সকলের পূর্ণামূর্ত্তি। যিনি, শঠতা, ধূর্ত্ততা, প্রবঞ্চনা, অধর্ম্ম, অকথ্য-অশ্রাব্য-কটুবাক্যপূর্ণ, বেশ্যাগৃহ দর্শন না করেন, যিনি এই পাপিয়সী রাক্ষসীদিগের আলিঙ্গন হইতে অন্তরে থাকেন। যিনি এই পাতকিনীদিগের ছায়াস্পর্শ না করেন। যিনি এই দুশ্চরিত্রাদিগের অঙ্গবায়ু অঙ্গে না লাগান, সেই মহাপুরুষের চরণযুগলে আমার সহস্র প্রণাম।

কমলাকান্ত, কুসুমকুমারীকে লইয়া এইরূপ অপার আনন্দে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে শরচ্চন্দ্র এবং সুরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দের উপর আনন্দ পড়িয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজান্তঃপুরস্থ পুষ্পবাটিকা।

মহারাজ অরিন্দমের বিজয়পুর রাজধানী, অতি মনোহারিণী নগরী; প্রশস্ত, পরিস্কৃত রাজপথ, পথের দুইপার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী, তাহার মধ্যে মধ্যে সুগঠিত আলোকস্তম্ভ, তৎপার্শ্বেই কিঞ্চিৎ অপ্রশস্ত অবকাশ, তাহার শেষসীমাতে নগরবাসীগণের দ্বিতল, ত্রিতলাদি মনোহর সৌধ-মালা এবং ব্যবসায়ীগণের বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত বিপণি শ্রেণী। পথের একতর পার্শ্বে পয়ঃপ্রণালী; স্থানে স্থানে মনোহর বিনোদো-দ্যান, অতিথিশালা, ভজনালয়, বিদ্যা-মন্দির, সুশোভিত সরোবর, চতুষ্পথ, পান্থশালা, বিশ্রামগৃহ, মল্লমন্দির, মন্ত্রণাগার, বিচারগৃহ, শান্তি-রক্ষকাবাস; নগরীর মধ্যভাগে রাজভবন—অতি মনোহর, সুদৃশ্য এবং আনন্দপ্রদ; বিবিধ কারুকার্য্য সম্বলিত, সুগঠিত সুশোভিত স্তম্ভ সংযুক্ত ত্রিতলাদি হর্ম্ম্যমালা। তদুপরি শ্বেত-পীত-নীল-লোহিতাদি নানাবিধ পতাকা নিরন্তর উড্ডীন হইতেছে। চাক্‌চিক্যময় কারুকার্য্যে সমুজ্জ্বলিত সৌধ সকল সূর্য্য-কিরণ-সংস্পর্শে প্রতিফলিত হইয়া, দশ দিককে প্রভাবিশিষ্ট করিয়া থাকে। বিবিধ বিলাস দ্রব্যে পরিপূর্ণ রাজ-ভবন দর্শন করিলে বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। রাজ ভবনের কোন স্থানেই মৃত্তিকা দেখা যায় না। নানা বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরে, প্রাঙ্গণ হইতে সমস্ত সৌধতল সমাচ্ছাদিত; ভিত্তি সকল অপূর্ব্ব দৃশ্য;—পঙ্খের কার্য্যে সুশোভিত। তদুপরি মনোহর প্রতিমূর্ত্তি সকল প্রল-ম্বিত; কাচনির্ম্মিত বিবিধ আলোকাধারে অলঙ্কৃত। হীরক মুক্তা-ফলযুক্ত স্বর্ণ নির্ম্মিত কৃত্রিম বৃক্ষ সকল, মার্ব্বল আসনে স্থাপিত

হইয়া গৃহ সকলের শোভাকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। বিবিধ নর নারীর বিবিধ প্রতিমা—স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়া হর্ম্ম্যাবলিকে মনুষ্য সঙ্কুল করিয়াছে। ফলতঃ রাজভবনের যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করুন—সেই দিকেই যাহা বাঞ্ছনীয় তাহাই দেখিতে পাইবেন। মন্দুরা, করীগৃহ, সেনা-ভবন, দাস-ভবন, ভৃত্য-গৃহ, মন্ত্রী-ভবন, কুঞ্জ-কানন, বন্ধুগৃহ, বিলাসগৃহ, দেবমন্দির, ক্রীড়ারণ্য সকল বিরাজমান আছে। রাজান্তঃপুর সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণীগণের বিহারোপযোগী গৃহের অভাব নাই। অন্তঃপুরের পার্শ্বেই নারীগণের ভ্রমণ জন্য মনোহারিণী পুষ্পবাটিকা। ইহাকে স্বর্গের নন্দন কানন বলিলেও বলা যায়। উদ্যানটি বর্গাকার। তন্মধ্যস্থ ভূমি সকল, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষেত্রে বিভক্ত, তাহাদের চতুর্দ্দিক-পরিষ্কৃত-অপ্রশস্ত ভ্রমণ পন্থায় সমাচ্ছন্ন, যে দিকে গমন কর সেই দিকেই অসংখ্য পথ পতিত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র সকলের মধ্য ও পথপ্রান্তভাগ জাতি, যূথি, গোলাপ, মল্লিকা বেল, জুঁই, ভূমিচম্পক, দ্বিপাটী, অশোক, কিংশুক, বিল্ব, ঝাউ, দেব-দারু, কদলী, আম্র, গন্ধরাজ, গন্ধা, অপরাজিতা, তরুলতা, কামিনী, কৃষ্ণচূড়, শেফালি, বকুল, স্থলপদ্ম, বক, জিরানিয়ম্, ভার্ব্বিনা, কাঞ্চন, ছউফর্ব্বিনা প্রভৃতি নানাবিধ তরু লতায় সময়ানুসারে পরিপূর্ণ ; লতা-গৃহ, লতাকুঞ্জ, লতাদ্বার লতামন্দিরে অলঙ্কৃত। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচি প্রভৃতি স্বর্গীয়া অপ্সরা বিনিন্দিত প্রতিমূর্ত্তি এবং অন্যান্য নানাবিধ আবৃত, অর্দ্ধাবৃত, উলঙ্গ প্রতিমা সকল স্থানে স্থানে মার্ব্বল স্তম্ভে—দণ্ডায়মান। সকল স্থানেই অসংখ্য আলোকাধার। লৌহ নির্ম্মিত, মার্ব্বল নির্ম্মিত, রৌপ্য নির্ম্মিত, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত আসন সকল অল্প অল্প অন্তরে স্থাপিত আছে। নীলজলে ঢল ঢল সরোবর সকল সম্প্রতি নলিনীমালায় অলঙ্কৃত হইয়া মনোহারিণী শ্রীধারণ করিয়া আছে। সুগঠিত তীর্থশিলা সকল সরোবরের চতুর্দ্দিকেই বিরাজিত।

এই মনোরম উদ্যান, সন্তপ্তের মহৌষধ স্বরূপ; এখানে ভ্রমণার্থে আগমন করিলে বোধ হয় যেন স্বর্গীয় সুরকাননে প্রবিষ্ট হইলাম——

ক্রমে ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে আগমন করিয়া স্বকীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিল। বসন্ত অনুচরেরা নিজ নিজ কার্য্যে তৎপর হইল। দক্ষিণ দিক হইতে মলয় বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীবগণকে প্রফুল্লিত করিতে লাগিল। নীরস বস্তু সরস হইল। সরস বস্তু হইতে রসপ্রবাহ বহিতে লাগিল। কোকিলগণ কুহু রবে শ্রবণ বিবরে অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তরুলতা নবপল্লবে সুশোভিত এবং মুকুল সমূহে অলঙ্কৃত হইয়া অবশেষে বিকশিত কুসুমনিকরে মনোহর হইল। সৌগন্ধে দশদিক আমোদিত হইল। মধুকরেরা বিকশিত পুষ্পসমূহের মধু-পানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে বসন্ত রাজের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। কালধর্ম্মে জীবমাত্রেই মিথুনভাব অবলম্বন করিল। নব নব ভাবে যুবক-যুবতী নবীন শ্রীধারণ করিল। স্বভাবের মনোহারিণী শোভায় পৃথিবী মনোহারিণী হইল। স্থলে কুসুমের হাস্য, জলে নলিনীর হাস্য, গৃহে যুবতীর হাস্য, শূন্যে চন্দ্রিকার হাস্য, বিবিধ হাস্যে ধরা হাস্যময়ী হইল। মদনশাসনে যুবক যুবতীর ক্রোধ ভঙ্গ, মানভঙ্গ এবং স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ হইয়া গেল। রাজভবন হইতে দরিদ্র ভবন পর্য্যন্ত আনন্দ স্রোতঃ বহিতে লাগিল। কেবল বিরহিণী, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা, বিধবা, এবং নববধূগণ দুঃখের ভাগ অধিকার করিল।

বসন্ত অতি মধুর সময়। এ সময়ে যাহার সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল না হয় তাহার তুল্য হতভাগ্য জগতে অতি বিরল। প্রকৃতির মনো-হারিণী শোভা, সকল শ্রেণীস্থ সকল লোকের অন্তঃকরণকে এক সময় না এক সময় সুখী করিবেই করিবে। এক দিন এই মনোহর সময়ের অপরাহ্লকালে মুরলা পুষ্পবাটিকায় গমন করিয়া বিবিধ কুসুম চয়ন করিলেন, এবং মনে করিলেন আজি বিজয়ের জন্য এক গাছি মনের মত মালা গাঁথিবেন। পদ্মপত্রে পুষ্প সকল স্থাপন করিলেন। পরে সূত্র

সংগ্রহের জন্য কদলীকাগুস্থ:ত্রর অনুসন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন এক নববিকশিত নবমল্লিকায় ভ্রমরদম্পতী পরস্পরের মুখে মধু দান করিয়া মনের সুখে মধুপান করিতেছে। পার্শ্বে চম্পক বৃক্ষে পরপুষ্ট কুহুরবে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। পুষ্পিতা মাধবীলতা সহকার বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া স্বর্গ বিদ্যাধরীর মনোহর নৃত্যকে হারাইয়া দিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া মুরলা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সময়ে রত্নমালা পুষ্পোদ্যানে আগমন করত মুরলাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া পুষ্পগুলি অপহরণ করিলেন, এবং এক লতামণ্ডপে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া তাহার ভাবগতিক দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কোকিল উড়িয়া গেল, ভ্রমরদম্পতী তাঁহার কর্ণের নিকটে উড়িয়া উড়িয়া গুন্ গুন্ স্বরে কি বলিল। মুরলার চমক হইল। সূত্র আনিয়া দেখেন পুষ্প নাই। আধার সহিত পুষ্প নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলেন। তথাচ পাইলেন না, ভাবিলেন এ কার্য্য কাহার—প্রাণনাথ কি উদ্যানে আসিয়াছেন! না রত্নমালা আসিয়াছে! যাহাই হউক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি, এই বলিয়া, হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন——

১ যতন করিয়া কুসুমনিকরে
তুলেছে মুরলা যাঁহার তরে।
সেই দেব আসি যদি পুষ্পরাশি
হরিয়া থাকেন আপন করে॥

২ ইহার অধিক কি আর ফলিবে
মুরলা দাসীর অদৃষ্ট ফল।
তৃষিতা চাতকী কাতরা হইয়া
মেঘ না চাহিতে পাইল জল॥

৩ অদৃশ্য ভাবেতে রহিয়া প্রাণেশ;
কেন হে দাসীরে যাতনা দাও।
দাও নাথ! মোরে দাও দরশন,
নতুবা দাসীর মাথাটি খাও।

৪ প্রাণনাথ মম আসিয়া এখানে,
লইলে আমার কুসুমচয়।
এ দিব্য শুনিয়া দিতেন উত্তর
রতি ডাকে কাম স্তব্ধে কি রয়?॥

৫ অয়ি রত্নমালে প্রাণেশ ভগিনি!
"কুসুম-হরণ" তোমারি কাজ।
কি সাধ? ভজিবি পুজিবি দাদারে,
স্মরিলে মানসে জনমে লাজ॥

৬ কহে রত্নমালা হাসিতে হাসিতে
মুরলার মোর বিধান ভাল।
তা-হ'লে মুরলে! সোদরে ত্যজিয়া
দাদার ঘর কি করিতে আলো?॥

মুরলা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—এ কি দৈববাণী হইতেছে? না—বনদেবীর মধুর পদাবলী, অথবা বাসন্তীদেবীর অমৃতবর্ষিণী-বাণী—আপনি কে? দেবী না মানবী? একবার দর্শনদানে কৃতার্থ করুন। লতাগৃহ-মধ্য হইতে প্রত্যুত্তর হইল—চর্ম্মচক্ষে দর্শন পাওয়া দুর্ঘট, পুণ্য বিনা সম্ভব না, পতিই নারীর পরম দেবতা, একবার তাহার উপাসনা কর, সেই পুণ্যফলে আমার দর্শন পাইলেও পাইতে পার। মুরলা উপাসনা আরম্ভ করিলেন—হে হৃদয়েশ! হে জীবিতেশ্বর! আপনি অবলার পরম গতি, পরম গুরু এবং পরম দেবতা, সেবিকা মুরলা—গলদেশে বসন প্রদান করিয়া মনের সহিত, প্রেমের সহিত, ভক্তির সহিত সেই কোকনদ সদৃশ যুগল চরণের ধ্যান করিতেছে—এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার নামের গুণে হংসকেতুর হৃদয়েশ্বরীর যিনি এক্ষণে বনদেবী হইয়াছেন—যিনি এক্ষণে মানব-হংসকেতুকে পরিত্যাগ করিয়া দেবের দেবী হইয়াছেন, তাঁহার দর্শন পাই। বনদেবী কহিলেন, তুমি যুবরাজ হংসকেতুকে চর্ম্মচক্ষে মানব রূপে দর্শন কর বটে—কিন্তু রত্নমালা তাঁহাকে দেবের দেব পরমদেব বলিয়া জানে। এক্ষণে একবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কর, তৎপরেই আমার দর্শন পাইবে। মুরলা যেমন প্রণাম জন্য মস্তক অবনত করিল, অমনি রত্নমালা ত্বরিতপদে আগমন করিয়া পূর্ব্বগ্রথিত, পরমসুন্দর এক গাছি মালা মুরলার গলদেশে প্রদান করিয়া সহাস্য আস্যে সবলে আলিঙ্গন করিল। হাস্যের উপর হাস্য পড়িয়া গেল। এই সময় তথায় সরোজবাসিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল কথা শুনিলেন। কত হাসি হাসিলেন। পরে সকলে মিলিয়া পুষ্পাভরণ

প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যগুণে এক-সাজ অলঙ্কার প্রস্তুত করিলেন। রত্নমালা তদ্দ্বারা মুরলাকে সাজাইতে বসিলেন। শিরোদেশ, কণ্ঠ, হৃদয়, হস্তদ্বয়, কটী, নিতম্ব, চরণযুগল কুসুম-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইল। সরোজবাসিনী কহিলেন, মুরলা আমাদের ফুলসাজে কি মনোহারিণী হইলেন। এ বাহার দেখে কে? এই সময় যদি দাদা একবার এখানে আসিতেন তবে দেখিতে পাইতেন—তাঁহার মুরলা কিরূপ মনোমোহিনী হইয়াছেন। মুরলা কহিলেন, এ সময় রাসবিহারী আসিয়া রাসে বসিলে অনেক গোপী পাইতেন, বসন্তাগমনও সার্থক হইত। পরে কহিলেন, সে যাহাই হউক, সরোজ! আমি তোমার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিতা। শুনিয়াছি তোমার স্বামী মূর্খ নহেন। তবে তিনি মুর্খের ন্যায় কাজ করেন কেন? এমন নববিকশিত-নলিনীকে বিস্মৃত হইয়া কিরূপে কালযাপন করিতেছেন। সরোজ কহিলেন, নববিকসিতা নবমল্লিকাও অনেক আছে। মুরলা কহিলেন, তাহাতে তাঁহার কি—পবিত্র পুরুষ কখন পরস্ত্রী স্পর্শ করেন না। সরোজ কহিলেন, আমি ত তাহাই জানি। মুরলা কহিলেন, তবে তাঁহাকে দোষ দাও কেন? এ তোমারই দোষ, তুমি আপনার জিনীষে আপনি যত্ন কর না কেন? সরোজ কহিলেন, আমি তাঁহাকে বিবাহ সময়ে একবার-মাত্র দর্শন করিয়াছি. এবার যদি দেখা পাই, তবে তোমার উপদেশ মত কার্য্য করিব। রত্নমালা কহিলেন, অয়ি মুরলে! তুমি সরোজবাসিনীকে দোষ দাও কেন, রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না। বিকসিত কুসুম, পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমরের অনুসন্ধান লয় না। অন্তঃপুর যাহাদের বাস-স্থান, লজ্জা যাহাদের অলঙ্কার, আত্ম-গোপন যাহাদের প্রধান ধর্ম্ম, নিবৃত্তি যাহাদের প্রিয় সঙ্গিনী, তাহাদের কি চঞ্চলা হওয়া উচিত? মুরলা কহিলেন, স্বামী যাহাদের গতি, স্বামী যাহাদের বাসনা পূরণের ক্ষেত্র, স্বামী যাহাদিগের হৃদয়ের হৃদয়, যাঁহাকে কুলবালা, কুল শীল লজ্জা, জীবন যৌবন সমস্ত সমর্পণ করিয়াছেন। সেই স্বামীকে

আবশ্যক হইলে, ধরিয়া রাখিব, প্রণয়-কোপে তিরস্কার করিব, মারিব, বাঁধিব ; যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিব, তাহাতে বাধা দেয় কে, কাহার সাধ্য, স্বামীরও এমন সাধ্য নাই যে প্রিয় শিষ্যার অমতে কোন কার্য্য করেন। ঐ দেখ সন্ধ্যা দর্শনে নলিনী, নলিনী-দল দ্বারা ভ্রমরকে, কেমন বন্ধন করিতেছে। নলিনীর হৃদয় কারাগার হইতে পলায়ন করে ভ্রমরের কি সাধ্য। রত্নমালা কহিলেন, ভ্রমর কোথায় ; আসিলে ত বন্ধন করিবে। যদি তুমি একবার বৃন্দে দূতী হইয়া, কৃষ্ণ আনিয়া রাধিকাকে দিতে পার তাহা হইলে শেষে ও-বোঝা পড়া করিয়া লয়। সরোজ কহিলেন, কৃষ্ণ আনিতে গিয়া যদি রাধিকা হইয়া বসেন! মুরলা কহিলেন, তাহাই যদি হয় তখন আমার কৃষ্ণকে বদল লইও। সরোজ কহিলেন, মুরলে! স্বামী অবলার কিরূপ ধন, তাহাতে কি প্রয়োজন, যৌবনে কি সুখোদয়, একাসনে উপবেশনে কি পরমানন্দ, চন্দ্রমুখ দর্শনে চকোরীর কি আনন্দোচ্ছ্বাস, কথোপকথনে কি অমৃত আছে, সংযুক্ত হৃদয়ে হৃদয়ে কি সুখপ্রবাহ বহে, সঙ্গত নয়নে নয়নে কি চটুলতা আছে, পরস্পর মৃদু হাসিতে কি মোহিনী শক্তি আছে, হাব, ভাব রঙ্গ রসে কি মোহকারিণী ক্ষমতা আছে, আমি তাহার কিছুই জানি না, এজন্য আমার পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা নাই। তুমি দিনযামিনী বিভাগ করিয়া উভয়ের ব্যবস্থা করিতে পার। সরোজের কথায় উভয়ে সহসা গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলেন এবং স্থিরচক্ষে, সরোজের ম্লান-মুখ-কমল-দর্শন করিয়া, রত্নমালা কহিলেন, ভগিনি! আমি তোমাকে বড় ভাল বাসী, আজি তোমার কথায় মনে বড় কষ্ট পাইলাম, এক্ষণে তুমি এক কার্য্য কর, কল্য একখানি পত্র লিখিয়া একটী পরিচারিণীকে পাঠাইয়া দাও, তোমার হৃদয়-বল্লভ কিরূপ ব্যবহার করেন জানিবার ইচ্ছা থাকিল। সরোজবাসিনী কহিলেন, দিব, তোমার কথা অলঙ্ঘ্য, দিব। কল্য না হউক আর দিন কয়েক অপেক্ষা করিয়া দিব।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রাচীন তপন প্রতীচীর

ক্রোড়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন। প্রতীচী সতী স্বামীর অনুমৃতা হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। চিতা প্রজ্জ্বলিত হইল। অনলশিখায় পশ্চিম-গগন রক্তবর্ণ হইল। প্রাচী সতী, পতিশোকে তমোময়বাস পরিধান করিলেন। শোকাতুরা নলিনী পতিশোকে অলিরূপ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, সন্ধ্যা দেখিয়া কুমুদিনীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। আহ্লাদে হাস্য করিয়া ফেলিল। কুসুম সকল, কুমুদিনীর হাস্যে যোগ দিল। আবার, গগনবিহারি দ্বিজরাজ, অতুল শোভায় উদয় হইয়া হাস্যের সহিত হাস্য মিলাইলেন। বিবিধ হাস্যে পৃথিবী হাস্যময়ী হইল। দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া মৃতপ্রায় নলিনীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিল। কোকিলগণ কু-উঃ,কু-উঃ রবে, পদ্মিনীর এবং বিরহিণীর মনের যাতনা জানাইতে লাগিল। স্বর্গে দেববালা এবং মর্ত্ত্যে নরবালাগণ দীপের মালা জ্বালিতে লাগিল। ধুপধুনার গন্ধ, কুসুমের গন্ধ, যুবক যুবতীর অঙ্গস্থিত-বিলাস বস্তুর গন্ধ, বিবিধ গন্ধে, দশদিক সুগন্ধিত হইল। দেবালয়ে আরতিরধ্বনি, গৃহে শঙ্খধ্বনি, উপাসকগণের উপাসনার ধ্বনি, মুনি ঋষি যোগীগণের বেদধ্বনি, সন্তপ্তের শোকধ্বনি, বালকবালিকাদের রোদনধ্বনি, কোকিলের কুহুধ্বনি, যুবতীর আনন্দ-ধ্বনি, বিযুক্ত চক্রবাক্ দম্পতীর কাতর ধ্বনি, নানাবিধ জীবগণের নানা-বিধ অব্যক্ত ধ্বনি, বিবিধ ধ্বনিতে ধরণী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যামুখে জনৈক রাজান্তঃপুরবাসিনী পরিচারিণী আসিয়া সংবাদ দিল, ঠাকুরাণী—উদ্যানমধ্যে যুবরাজ আসিতেছেন ; তচ্ছ্রবণে রত্নমালা এবং সরোজবাসিনী দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন, কেবল মুরলা উদ্যান মধ্যে রহিয়া গেলেন। যুবরাজ উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ মুরলার অনুসন্ধান করিতেছেন। এমন সময়ে হৃদয়হারিণী আগমন করিয়া পতির গলদেশে এক গাছি সূচিক্কণ মালা প্রদান পূর্ব্বক কর-যোড়ে কহিলেন, দাসীর প্রতি কি আজ্ঞা হয়। যুবরাজ, মুরলার বেশ-ভূষা দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, মুরলে ! এ-কি-এ ! আজি

যে মদনের রতি সাজিয়াছ। আজ্ঞা হাঁ, এ বিনয়-মদনের মুরলা রতি; আজি ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া কুসুমশয্যা প্রস্তুত করত, বহুক্ষণ মদনের আরাধনা করিতেছে। সত্য কি না, আসিয়া দর্শন করুন। এই বলিয়া হস্ত ধরিয়া লতাগৃহে লইয়া চলিলেন। যুবরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, অপূর্ব্ব কুসুমশয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে। মুরলার আগ্রহে যুবরাজ উপবেশন করিলেন। মুরলা পূর্ব্বাহৃত কুসুমরাশি হইতে অঞ্জলি অঞ্জলি কুসুম লইয়া যুবরাজের চরণযুগলে প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন। যুবরাজ সাদরে প্রিয়াকে আলিঙ্গন দিলেন, অঙ্কে বসাইলেন, অপূর্ব্ব আবেসে, মনোহর আননের আলোহিত অধরোষ্ঠে—আলোহিত অধরোষ্ঠ মিলিত করিয়া, সবলে চুম্বন করিলেন। মুরলা বাহুলতায় গলদেশ বেষ্টন করিয়া কহিলেন, আপনি আমার অনেক ধার করিয়াছেন আজি আমি তাহার কিছু পরিশোধ লইব। এই বলিয়া যুবরাজের কার্য্যের পুনরভিনয় করিলেন। যুবরাজ মুরলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব প্রণয়সুখ অনুভব করিতে করিতে কহিলেন, মুরলে! দেখ দেখ—অগ্রজ মহাশয় গৃহে গমন করিলেন কি না ইহা দেখিবার নিমিত্ত, ভগবান চন্দ্র বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কেমন মুখ তুলিয়া দেখিতেছেন। কুমুদিনী প্রিয় পতির ভাব দর্শনে কেমন মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছে। মরি! মরি! সরোবরের কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে। মুরলা কহিলেন, কুমুদিনীর বাহারই মনে ধরিল—মুরলার বাহার বুঝি আর বাহার নয়। আমার হৃদয় সরোবরের শোভা বুঝি আর শোভা নয়। আমার হৃদয়ের হার, মস্তকমণি এই অকলঙ্ক পূর্ণ শশীর সহিত বুঝি ঐ কলঙ্কী চাঁদের তুলনা হয়। এই বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা বিনয়ের চিবুক ধরিয়া থারেক দুইবার নাড়িয়া দিলেন, এবং উত্থিত হইয়া পতির হস্ত ধরিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সরোজ-বাসিনীর পত্র।

সরোজবাসিনী যে কেবল অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন, এমন নহে। অসামান্য গুণবতীও ছিলেন। কি গৃহ কার্য্যে, কি শিল্প কর্ম্মে, কি সেবা শুশ্রূষায়, কি সঙ্গীত বিদ্যায়, সকল বিষয়েই পারদর্শিনী ছিলেন। উত্তম লেখা পড়াও জানিতেন। বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মিয়াছিল। কিছু দিন পরে রত্নমালার আদেশ মত সরোজবাসিনী নিজ শয়ন-ভবনে উপবেশন করিয়া প্রাণপতিকে একখানি পত্র লিখিলেন। শিরোনামা দিলেন। পরে পত্রখানি কিরূপ লেখা হইল—পাঠ করিতে লাগিলেন——

"প্রাণনাথ! জীবিতেশ্বর! সরোজবাসিনীর মস্তকমণি কমলাকান্ত!

স্বামিন্! দেব-কমলাকান্ত! প্রাণকান্ত! এ দাসীকে কি বিস্মৃত হইয়াছেন। কে, আপনার চরণ সেবা করিতেছে? "আমার সেবিকা আছে" একথা কি একবার মনেও করিতে নাই—কত কথা লিখিব-বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু লজ্জা আমার হস্ত বন্ধ করিয়া দিল। আর লিখিতে পারিলাম না। অবশেষে প্রার্থনা এই, এ দাসীকে কি দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন না? অথবা চরণোপান্তে কিঞ্চিৎ স্থানার্পণ করিবেন না? ভিক্ষা এই—এই পরিচারিণী সমভিব্যাহারে আগমন করিতে আজ্ঞা হয়, আপনার দাস নুদাসী শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী অভিন্ন হৃদয়া।"

প্রাণেশ্বর! শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

সরোজবাসিনী সেবিকা প্রতিপালকেষু

পত্রখানি পাঠ করিয়া বন্ধ করিলেন। আঠা দিয়া ভাল করিয়া আঁটিলেন। স্বকীয় বিশ্বস্ত পরিচারিণীর হস্তে দিয়া শ্রীপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

পরিচারিণী তথায় উপস্থিত হইয়া গোপনে কমলাকান্তের হস্তে পত্র দিয়া কহিল, একবার পাঠ করুন—করিয়া প্রত্যুত্তর দিউন, না হয় আমার সঙ্গে তথায় আগমন করুন। আপনার যাহা অভিরুচি।

কমলাকান্ত, পত্র পাঠ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর লিখিয়া পরিচারিণীর হস্তে দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। দাসী আসিয়া যথাকালে পত্র দিল। সরোজবাসিনী পাঠ করিতে লাগিলেন।

কল্যাণীয় সরোজবাসিনি! কুলকামিনীদিগের অধৈর্য্য হওয়া উচিত নহে। তুমি যেরূপ নির্লজ্জভাবে পত্র লিখিয়াছ, তাহাতে তোমার প্রতি ঘৃণা জন্মে। আমার যখন ইচ্ছা হইবে তখন যাইব কিম্বা তোমাকে আনিব। তোমার ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা—

পত্রপাঠ করিয়া সরোজবাসিনীর প্রাণ উড়িয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন এ-কি !! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল কেন। এরূপ প্রত্যুত্তর কেন পাইলাম। ইহা কি আমার প্রাণকান্তের হস্তাক্ষর! ইহা কি আমার প্রাণপতির স্বহস্ত লিখিত পত্রিকা? তাঁহার হৃদয় কি এতই কঠিন; পিতা বলেন, কমল সুপণ্ডিত, দয়ালু, পরোপকারী, ধার্ম্মিক এবং মিষ্টভাষী; এই কি তাঁহার গুণের পরিচয়। কোন মায়াবিনী রাক্ষসী কি তাঁহার হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। এ-কি! এখন কি করি, কোথায় যাই, এ পত্র কেমন করিয়াই বা দিদী রত্নমালাকে দেখাই, তিনি জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব। হা বিধাতঃ আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল, বলিতে বলিতে অভিভূত হইলেন। চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। সহসা স্থির হইলেন, ভাবিলেন আর একবার পত্র লিখিব, দেখি তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, কি-না, এই ভাবিয়া স্থির হইলেন আবার পত্র লিখিলেন এবং মন দিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন——

প্রাণেশ্বর! আপনি কি আমার অন্তঃকরণ পরীক্ষাকরিবার জন্য এইরূপ প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। আমি অধীরা বা লজ্জা হীনা নহি। আমার পরম পবিত্র সতীত্ব রত্ন, পরম-পবিত্র অবস্থাতেই আছে এবং চিরকাল এই ভাবেই থাকিবে। আমি ঐহিক সুখের জন্য লালায়িত নহি। পারত্রিক সুখের জন্যই চরণ সেবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আনুষঙ্গিক

অন্য সুখ ঘটে, ভালই, না ঘটে, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। যদি আমার মন পরীক্ষার জন্য এ পত্র হয়, তবে প্রার্থনা এই, অবিলম্বে আমাকে লইয়া যাইবেন। আর এক দিনও এখানে রাখিবেন না। আমার বাল্যকাল অতীত হইয়াছে, এখন আমি যুবতী। পিতৃগৃহ বাসের সময় গিয়া, এখন পতিগৃহ বাসের কাল হইয়াছে। এসময় চরণে রাখিলেই চরিতার্থ হই। আমি এখানে এখন হাজার পবিত্র অবস্থাতে থাকিলেও, আপনার অভাবে লোকে আমায় নিন্দা করিবে। সে কলঙ্কে আপনারও কলঙ্ক আছে। এজন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রার্থনা এই, আমাকে অবিলম্বে লইয়া যাইবেন।" প্রত্যুত্তর আসিল—পাঠ করিতে লাগিলেন, আমি তোমার পত্র পাইলাম, পাঠ করিলাম, সকল বুঝিলাম—প্রত্যুত্তরও দিলাম। তুমি আমার আশা ত্যাগ কর। এক ব্যক্তি কখন দুই জনের প্রণয়-পাত্র হইতে পারে না। কুসুম আমায় কিনিয়াছে। সে নামেমাত্র বারনারী, কিন্তু প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী অপেক্ষাও সহস্রগুণে হৃদয়হারিণী। আমি শপথ করিয়া তাহার হইয়াছি। আর তোমাকে লইবার উপায় নাই। তুমি আপন উপায় আপনি করিও।

পত্রপাঠে সরোজবাসিনীর প্রাণ উড়িয়া গেল। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। চতুর্দ্দিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সংসার ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হওত সপ্তপাতাল তলে গমন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণের পর মোহাপগত হইল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন—মনে মনে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পত্র বাহিকাকে ডাকিয়া বারনারী কুসুমকুমারীর বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচারিণী, সকল জানিয়া আসিয়াছিল। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত নিবেদন করিল। সরোজবাসিনী কহিলেন, পিতামাতাকে এ সংবাদ কদাচ শ্রবণ করাইও না। আর একবার গোপনে তথায় গমন কর। আমি যাহা লিখিয়া দিই, তাহা নির্জ্জনে প্রাণনাথের হস্তে দিয়া প্রত্যুত্তর আনিয়া দাও। আমার এই শেষ ভিক্ষা

আর আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। বহুকষ্টে পত্র লিখিলেন এবং পাঠ করিতে লাগিলেন "হৃদয়েশ! নারীর পরম ধন! আপনি আমার লজ্জা রক্ষা না করিলে আর কে করিবে? পতিই সতীর পরম ধন, আমি সেই ধনে বঞ্চিত হইয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব। আজি আমার লজ্জা অন্তর্হিত হইয়াছে। ধৈর্য্য বিচ্যুত হইয়াছে। আজি আমি, আমার মনের সকল কথা লিখিব—প্রাণনাথ! একবার ভাবিয়া দেখুন, আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী, অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ করিয়াছেন। আমার মনে কষ্ট দেওয়া আপনার উচিত নহে। আমার কলঙ্কে আপনার কলঙ্ক আছে। আমি কষ্ট পাইলে লোকে আপনাকে নিন্দা করিবে। আপনি তরু, আমি লতা; আপনি দেহ, আমি ছায়া; আপনি চন্দ্র, আমি চন্দ্রিকা। আপনার অভাবে আমার কি গতি হইবে? পতিবিহীন, জীবন যৌবনে কি সুখোদয়? পতি হীন বেশভূষায় কি আবশ্যক আছে। পতি হীন নারী জন্মে কি সার্থকতা? স্বামিন্—অবলার ধন! জীবনের জীবন! আমি গলদেশে বসন প্রদান করিয়া করযোড়ে এই প্রার্থনা করিতেছি, আমায় ত্যাগ করিবেন না। দেখুন, আমি বালিকা, আমাকে নয়ন-নীরে ভাসান আপনার উচিত নহে। আমি দর্শনের ভিখারিণী, কুসুম আপনার ভালবাসা হয়, সে আপনার থাকিবে। আমি তাহার প্রতিবন্ধক হইব না। আমি কেবল চরণ দর্শনের ভিখারিণী—এ-নারী জন্মে বিবাহ কালে একবারমাত্র চরণ দর্শন

করিয়াছি। ভিক্ষা এই, আর একবার চরণ দর্শন করিব। আমাকে, একবার লইয়া যাউন, অথবা আসিয়া দর্শনদানে কৃতার্থ করুন। জীবিতনাথ! সতীর পরম গতি! আমার নারীজন্ম কি বিফলে যাইবে। আমি চন্দনমিশ্র পুষ্পদাম দিয়া কি, একবার সেই রাঙাচরণ যুগলের পূজা করিতে পারিব না? আর কেন, অনেক হইয়াছে। যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি ক্ষমা করুন। দাসানুদাসী, দাসীর প্রতি কোপ কেন? পায়ে পড়ি, যোড়হাত করি, আমাকে লইয়া যাউন। আমি তথায় গিয়া আপনাকে বিরক্ত করিব না। আপনার কাজে বাধা দিব না। আমাকে আপনার কোন ভয় নাই। দাসী কি মতের বিপরীত কোন কাজ করিতে পারে। দয়াময়! দয়া বিতরণে আমাকে রক্ষা করুন, আমি বড় কাতর হইয়াছি। আমাকে চরণে ঠেলিবেন না।"

আপনার চরণ সেবার্থিনী দাসী সরোজবাসিনী দেবী।

কমলাকান্ত; আনীত পত্র পাঠ করিলেন, অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন পরে শয্যাগৃহে গিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন। হস্ত কম্পিত হইল, লেখনী ভূমিতে পড়িয়া গেল। পুনর্ব্বার কুড়াইয়া লইলেন। আবার বাধা পড়িল। তথাচ লিখিতে বসিলেন।

পাঠক মহাশয়! এইবার আমার উভয় সঙ্কট, কি করি কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। পারদারিক-কমলাকান্তের-অকথ্য নিষ্ঠুর কথা লেখনী দ্বারা নির্গত করিয়া লেখনীকে অপবিত্র করিয়া সতীর পবিত্র হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণানল প্রজ্জ্বলিত করি; কি তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হই—কি করি কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না, কিন্তু স্বর্গস্থা সরোজবাসিনী, নিরন্তর দৈববাণী দ্বারা আমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন, "লেখক! তুমি আমার সকল কথাই লিখিবে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না।" সেই আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য্য—

কমলাকান্ত লিখিলেন, "সরোজ! তোমার পত্র পাঠ করিয়া আমার মনে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হইল। আমার বিশেষ বোধ

হইল, তুমি কলঙ্কিনী, আপনার নির্ম্মল চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া কোন বিপদে পতিত হইয়া লজ্জা রক্ষা জন্য আমার শরণাপন্ন হইতে চাহিতেছ। নতুবা তোমার এত জেদ, এত আগ্রহ, এত প্রার্থনা কেন? যুবতী স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকিলে প্রায় পবিত্র থাকে না; তোমারও সেই দশা ঘটিয়াছে, আমি অপবিত্রা কুল কলঙ্কিনীকে গৃহে আনিব না। আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহি না। অদ্য হইতে তুমি আমার নাম ভুলিয়া যাও। আমিও ভাবিব তোমার নাম পৃথিবী হইতে লোপ হইয়াছে। পুংশ্চলি! আর তুমি আমাকে পত্র লিখিও না।"

শ্রীকমলাকান্ত।

কমলাকান্ত পত্রখানি বন্ধ করত বাহিকাকে দিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে কুসুমের বাটীতে গমন করিলেন। এ দিকে পত্রবাহিকা, সরোজবাসিনীকে কমলাকান্তের পত্র প্রদান করিল। সরোজবাসিনী অবিলম্বে উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করত সংজ্ঞা হারাইলেন। বহুক্ষণ এইভাবে গেল; তৎপরে সংজ্ঞালাভ হইলে আর রোদন করিলেন না। বিহ্বলার ন্যায় ক্ষণকাল বসিয়া থাকিলেন। তদনন্তর সময় বুঝিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিলেন। স্বামীর সেই বিষপূর্ণ শেষ পত্রখানি, কবরী মধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেন। প্রবল গ্রীষ্ম; সরোজবাসিনী সেই ভয়ানক সময়ে জয় জগদীশ বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কেহই জানিতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণাহুতি।

পাঠক মহাশয়! শরচ্চন্দ্র, একবার আপনাদের নিকট পরিচিত হইয়াছে। এ-কুলীন সন্তান; ভঙ্গ কুলীন নহে, কুল, থিলজ্ঞান, আচার,

এই নরাধম কৌলীন্য-মর্য্যাদা-বলে অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছে। স্ত্রীগণের সহিত কোন কালে সাক্ষাৎ হয় কি না সন্দেহ; তাহারা পিত্রালয়েই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। নিজে কাহার এমনই বরপুত্র যে গৃহে দুই বেলা অন্ন হওয়া ভার। বিষয় সম্পত্তি কিছু মাত্র নাই। একখানি সামান্য মৃত্তিকার গৃহ আছে। তাহাও তৃণাভাব বশতঃ সছিদ্র, শরচ্চন্দ্রের যখন অর্থের নিতান্ত অপ্রতুল হয়, তখনই কোন না কোন স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং কিছু পাইবার প্রত্যাশা দেখিলেই অবস্থান করে, নচেৎ পত্নীগৃহে পাদ-ধৌতও হয় না। পূর্ণ যৌবনা অবলার নেত্রনীরেও পাষাণ হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয় না। শরচ্চন্দ্র এইরূপ করিয়াই কাল যাপন করিয়া থাকে। এক্ষণে শরচ্চন্দ্রের গৃহে শরচ্চন্দ্রের শৈলবালা নাম্নী এক স্ত্রী অবস্থান করিতেছে। ইহার পিতৃগৃহে কেহ আশ্রয় দাতা নাই। শৈলবালার পিতা পূর্ব্বে অনেক অর্থ দিয়া, শরচ্চন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে কাল, তাঁহাকে ধনে প্রাণে নষ্ট করায়, শৈলবালা অনন্যগতি হইয়া স্বামীগৃহে আগমন করিয়াছে। শৈলবালা দেখিতে সুরূপা, পূর্ণ যৌবনা; কিন্তু সে যৌবনে সারল্য নাই, কারণ শৈলবালা অমূল্য সতীত্ব রত্ন দিয়া অনেক দিন হইল কাচখণ্ড ক্রয় করিয়াছে। পবিত্র দেহকে কলঙ্কিত করিয়াছে। স্বকীয় সতীত্বরূপ কোহিনূর মণিকে পদদলিত করিয়া নারীকুলে কলঙ্কার্পণ করিয়াছে। স্বামীর প্রতি পুংশ্চলীর যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধাদির হ্রাস হইয়া থাকে শৈলবালার তাহা হইয়াছিল। শরৎ এবং শৈল একত্রিত হইলেই ঘোর সমর বাধিয়া যাইত। পাপ বিষয়ে উভয়েই তুল্য; কেহ কাহা হইতে ঊন নহে। বিবাদ কালীন তাহাদের বিষপূর্ণ অকথ্য অশ্রাব্য বাক্য, পরস্পরের হৃদয়কে দগ্ধ করিত এবং ক্রোধ সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। শরৎ স্ত্রীর এইরূপ দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়াও মানের ভয়ে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে নাই। আরও এক কারণ, শৈলবালা সর্ব্বদা শরৎকে এই বাক্য বলিয়া শাসন করিত যে, তুমি আমায়

অনুজ্ঞা দিলে আমি এই প্রদেশে বসিয়াই হেলায়ুক্তি করিব। অপটা কালভুজঙ্গিনী হৃদয়ে বসিয়াই শরৎকে দংশন করিত। শরচ্চন্দ্র স্ত্রীর কুচরিত্র জানিয়াও জানিতে পারে নাই। শরচ্চন্দ্রও ঘোর নারকী— তাহার হৃদয় ধূর্ত্ততা, প্রবঞ্চনা, অধার্ম্মিকতা, অসত্যবাদিতায় পরিপূর্ণ; নানাবিধ দুর্ঘটনায়, অসচ্চরিত্রের সহবাসে, হলাহল স্বরূপ বারুণী সেবনে শরতের অন্তঃকরণ নিতান্তই কলুষিত হইয়া পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছিল। ক্রমে শরৎ এমনই দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিল যে তাহার নাম কীর্ত্তনেও বোধ হয় প্রভূত পাপরাশির সঞ্চয় হয়। সুরেন্দ্র, শরচ্চন্দ্রের অনুরূপ; উভয়ে, স্বভাবগুণেই বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। উভয়ে উভয়ের বাটীতে গমনাগমন করিয়া থাকে। মাতাল এবং মহাপাপী হইলে প্রায়ই ধর্ম্মজ্ঞান থাকে না। কালক্রমে সুরেন্দ্র শৈলবালার প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইল। সুরেন্দ্র বংশজ ব্রাহ্মণ, বিবাহ হয় নাই; শৈলবালাকে হস্তগত করিয়া বন্ধুত্বের বিশেষ পরিচয় দিল। এ-দিকে শরচ্চন্দ্রও সুরেন্দ্রের বালবিধবা সুপবিত্রা ভগিনী ইন্দুমতীর সতীত্ব রত্ন অপহরণের বিশেষ চেষ্টায় থাকিল। সুরেন্দ্রের পিতা, অল্পবয়সেই বয়স্ক পাত্রের সহিত ইন্দুমতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইন্দুমতী বিধবা—অনাথিনীর যে যন্ত্রণা তাহা বিধবা রমণী ভিন্ন অন্যে জানেন না। নির্দ্দয় পাপাসক্ত পুরুষ হৃদয়, সে যন্ত্রণা অনুভব করিতে অশক্ত।

দেশাচার—ধন্যরে দেশাচার! তোর চরণে সহস্র প্রণাম, তোর প্রবল প্রতাপে স্বর্ণ ক্ষেত্র ভারতবর্ষ ছারখার হইল। তোর অকার্য্য কিছুই নাই। লোকে তোর ভয়ানক শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া কোন্ অকার্য্য না করিতেছে! তুই কখন স্বয়ং কখন বা রাজাজ্ঞা স্বরূপে ভারত-বাসীর হৃদয়ে আসীন হইয়া তাহাদিগকে কোন্ কার্য্য না করাইতে-ছিস্। কি কৃতবিদ্য, কি মূর্খ, কি প্রাচীন, কি যুবা, বল্, কোন্ ব্যক্তি না তোর আজ্ঞা প্রফুল্ল চিত্তে বহন করিতেছে। লোকে তোর্ কোহিনী মায়ায় মোহিত হইয়া মূর্খতম অর্থহীন কুলীন সন্তানকে প্রাণাধিকা

দুহিতার সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে। এক ব্যক্তির বহুপত্নী সত্বেও তাহাকে কন্যাদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। অনন্তরে স্বর্ণ-প্রতিমা দুহিতাকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইতেছে। রমণী পক্ষে সপত্নী কালরাত্রি স্বরূপা; রমণী, হৃদয়েশ পতিকে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি করে পতিত দেখিয়াও ধৈর্য্য ধরিতে পারে সমস্ত কার্য্যে নিতান্ত অক্ষম হইলেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, এমন কি ভীষণ শমনের করালগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়াও অন্তঃকরণে স্থির থাকিতে পারে, তথাচ সপত্নীর অঙ্কে প্রিয়পতিকে শয়ান দেখিয়া কদাচই ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। আমি অনেক সময়েই রমণীগণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়াছি যে "স্বামীকে যমের মুখে দিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিব তথাচ সপত্নীকে দিতে পারিব না;" রে দেশাচার! দেখ্ লোকে তোর ভীষণ শাসনে, কেমন সেই প্রাণপ্রতিম কন্যারত্নকে সেই সপত্নী যন্ত্রণারূপ ঘোর অনলে প্রফুল্ল মনে নিক্ষেপ করিতেছে। কেমন মুমূর্ষু দশাগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত প্রিয়তমা কন্যার বিবাহ দিয়া স্বকীয় উচ্চ কুলগৌরব রক্ষা করিতেছে। ঘোর পাপী নরাধম কুলীন সন্তানও ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়া বহুবিবাহ করিয়া আপনার মরণে এককালে অনেক কুলবালাকে বৈধব্য যন্ত্রণা প্রদান করিয়া আপনার জন্য অক্ষয় রৌরব নরক সঞ্চয় করিয়া যাইতেছে। বাল্য বিবাহও সমাজের পরম শত্রু; এই কুৎসিত প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকায়, অসময়ে কামিনী সকল কন্যাপুত্র প্রসব করিয়া স্বাস্থ্য-ভঙ্গ করিয়া ফেলেন। অপক্ক বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান সন্ততি সকলও অকালে শমন-সদনে গমন করিয়া সেই মহাপাপের প্রতিফল প্রদান করিয়া থাকে। সুস্থকায় সবল শরীর প্রফুল্ল চিত্ত বালকও অসময়ে স্ত্রী সহবাসে দেহকে রুগ্ন ও ভগ্ন করিয়া প্রকৃত যৌবনে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অল্প বয়সেই জীবনলীলা সম্পন্ন করে। কোন কোন স্থলে বালিকা যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতে না করিতেই হত ও বিধবা হইয়া থাকে। অপর

যাঁহারা অর্থ দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করেন। তাঁহাদের রমণীগণও, অল্প বয়সে প্রায়ই বিধবা হইয়া থাকেন। কন্যাক্রয়, বহু-বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বৃদ্ধের বিবাহ, সমাজের অনেক শত্রু; ভারতের ললনাকে অকালে অকাল মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়া কি সর্ব্বনাশই না করিতেছে। স্বার্থান্ধ শাস্ত্রকর্ত্তাগণও বিধবা বিবাহ নিষেধ করিয়া, স্বহস্তে ভয়ঙ্কর বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সেই বিষবৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ সমাচ্ছাদিত করিয়া আছে। ভারত-কামিনীগণ সেই বিষবৃক্ষ ছায়ায় আসীনা হইয়া, বিষের জ্বালায় জ্বালাতন হওত, হাহাকার রবে অজস্র অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছেন।

প্রগাঢ়বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সদয়-হৃদয় যুবকগণ, দূরদর্শী মহাত্মা প্রবীণগণ, বিজ্ঞতম পূজ্যপাদ বৃদ্ধগণ! ঐ দর্শন করুন অল্পবিধবা নবীনা বালা, রাজপথে দণ্ডায়মানা হইয়া মর্ম্মবেদনায় কাতর হওত হা স্বামিন্! হা স্বামিন্! বলিয়া রোদন করিতেছেন। ঐ সরোবর তটে অপরা পতিহীনা বালিকার সজল নয়ন দর্শন করুন। অনতিদূরে ঐ তীর্থবিলাসিনীর কনক-নলিনীর নয়ন নীর সরোবর-জল প্লাবিত করিতেছে একবার অবলোকন করুন। ভারতবাসিন্! এইক্ষণ, কি দুঃখীর গৃহ, কি মধ্যবর্ত্তীর গৃহ, কি ধনীর গৃহ, কি নরপতির গৃহ, যেখানে নয়ন নিক্ষেপ করিবেন সেইখানেই অসংখ্য বিধবাগণের রোদনধ্বনি শুনিতে পাইবেন। পতিহীনা নবীনাগণের রোদন ধ্বনি, বক্ষদেশে করাঘাতের হৃদয় বিদারক ধ্বনি, শিরস্তাড়ন জনিত দুঃখোৎপাদক ধ্বনি, আলুলায়িত কেশগুচ্ছবসনায় হা স্বামিন্ শব্দে পতন ধ্বনি, শোক-জনিত করুণ বিলাপের করুণ ধ্বনি, আত্মবন্ধুর অনুতাপ ধ্বনি, গগনস্পর্শী ধ্বনি সকলের প্রতিধ্বনি, বিবিধ ধ্বনিতে শ্রবণ যুগল বধির হইল। আর সহ্য হয় না,— পাপ নয়নে আর দর্শন করা যায় না। আজি যে স্বর্ণবর্ণা ষোড়শী রমণী বসনভূষণে অলঙ্কৃতা হইয়া, রূপের মনোহারিণী, কল্য তাহাকে দীনা হীনা বিধবার বেশ ধারণ করিয়া বহিছে। অন্তঃকরণ দ্রবীভূত সা-

হয়। লক্ষ লক্ষ বিধবার চক্ষের জলই আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। আমরা একদিকে যেমন অবলা রমণীগণকে নিয়মাধীনী করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিতেছি; অন্য দিকে তেমনই তৎপ্রতিফল স্বরূপ সহস্রগুণ দণ্ড ভোগ করিতেছি। আমরা অবলা-পীড়নরূপ পাপে ঘোর পাপী।

আমরা, স্ত্রীগণের উপর বীর্য্য প্রকাশ, বালকগণের উপর প্রভুত্ব প্রকাশ, বন্ধুগণের নিকট গৌরব প্রকাশ, প্রতিবেশীর উপর বল প্রকাশ, সাধুর নিকট অহঙ্কার প্রকাশ, গুরুর নিকট বাচালতা প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়া অতি ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছি। নিত্য পরিবর্ত্তন জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; (আমরা) ইহা জানিয়াও মনুষ্যকৃত নিয়ম পরিবর্ত্তনে সাহসী নহি। স্বার্থপরতা সর্ব্বনাশের মূল; ইহা হইতেই আমরা অধঃপাতে যাইতেছি। পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হইলে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু রমণী তাহা পারেন না—এ কি ভয়ানক স্বার্থপরতা! মনোবৃত্তি সকল, সকল শরীরেই সমানরূপে অবস্থান করিতেছে। পরম পিতা পরমেশ্বরের বিধানে কার্য্য করিয়া কে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, আর কেবা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে অক্ষম, রমণীগণ প্রকাশ্যরূপে মনোবাসনা পরিপূরণের ব্যাঘাত দেখিয়া গোপনে গোপনে কোন্ অকার্য্য না করিতেছেন। দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে কুল শীল লজ্জা ভয়ে কত জ্রণহত্যা কত আত্মহত্যা না হইতেছে। দিন দিন কত কত পবিত্র বংশই বা কলঙ্কিত না হইতেছে। পাপস্রোতেঃ ভারত প্লাবিত হইতেছে। আমরা তাহার আবর্ত্ত মধ্যে পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছি। পাপস্পর্শে আমাদের মনের উচ্চবৃত্তি ও উচ্চ ভাব সকল পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে কেবল কতকগুলি নীচ প্রবৃত্তি আমাদের দেহরাজ্য অধিকার করিয়া আছে। আত্মনিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, মনের একতা, কোথায় চলিয়া গিয়াছে? এক্ষণে আমরা পরস্পরের অধঃপতনে পরস্পরে সন্তুষ্ট হই; কিসে—স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রিয়তম ভ্রাতার সর্ব্বনাশ করিব চিন্তিত মস্তক করা থাকি; আত্মার অপমানে হাস্য করি,

ভ্রাতার কলঙ্কে প্রফুল্লিত হই; ভ্রাতার দারিদ্র্যদশা দর্শন করিলে, আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হই। মনের একতা না থাকাতেই আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। পাপের ফল দুঃখ; যখন অকার্য্য করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতে শিক্ষা করিয়াছি; তখন অবশ্যই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যখন আমরা ঘর ভাঙ্গিয়া পৃথক অন্ন ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করিয়াছি, যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিয়া সদ্ভাব করা বন্ধ করিয়াছি। যখন স্বধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতার হৃদয়-রক্ত পান করিতে শিক্ষা করিয়াছি। যখন বিপদ্গ্রস্ত ভ্রাতার আর্ত্তনাদে বধিরভাব অবলম্বন করিয়া উদাসীন হইতে অভ্যাস করিয়াছি। তখন আমাদের অধঃপতন না হইয়া আর কোন্ পুরাতন জাতির হইবে। আমরা এমন নরাধম, হীনসাহস ও কাপুরুষ হইয়াছি যে, ভরসার ভরসা, বাহুর বল, দুঃখের দুঃখী, জীবনের জীবন ভ্রাতা; বিধর্ম্মীর করকবলিত এবং নিপীড়িত হইয়া, পরিত্রাণ লালসায় আর্ত্তস্বরে ভাই ভাই বলিয়া চিৎকার করিলেও, উপযুক্ত সময়ে আমরা বাহুবল প্রকাশে অগ্রসর হই না। সাহস দেখাইবার উপযুক্ত সময়েও সাহসী হই না। এক জন ঘৃণিত বিধর্ম্মী সামান্য কীট, প্রিয়তম ভ্রাতাকে পদ-দলিত করিতে থাকে, আর আমরা শতাধিক ভ্রাতা তাহার চতুঃপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া, তাহার সাহায্য করা দূরে থাকুক্ বরং সেই নরাধম বিধর্ম্মীর সহিত যোগ দিয়া কাপুরুষত্বের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অশোচ্য রৌরব নরক সঞ্চয় করিয়া থাকি। আমরা সকল ভ্রাতায় মিলিয়া চক্ষের জল দিয়া, বিপদ্গ্রস্ত ভ্রাতার চক্ষের জল না মুছাইয়া, বিধর্ম্মীকে সাহায্য দিয়া বরং তাহার সেই নয়ন-নীর শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকি। হায়, অধঃপাতে যাইতে আর আমাদের কি বাকি আছে। ভাই সকল! একবার ভাবিয়া দেখুন—আমাদের মান সম্ভ্রমের মস্তকে নিরন্তর পদাঘাত হইতেছে কি না। গৃহে আর গৃহ সামগ্রী নাই। অধিক কি আমাদের হৃদয় রত্ন পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে। রত্নপ্রসূ ভারতমাতা—

এই কাপুরুষ সন্তানগণের দারুণ দুর্দ্দশা দর্শনে দুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া বক্ষে করাঘাত করতঃ ঐ শুনন হাহাকার রবে রোদন করিতেছেন। জননীর সে মনোহর সৌন্দর্য্য কোথায় পলায়ন করিয়াছে। নব-বিকশিত-নলিনী-সদৃশ-মুখ-কান্তিতে কালিমা পড়িয়াছে। দেহ শ্মশানভূমি প্রায় হইয়াছে। রাজরাণী আজি স্বাধীনতা হারাইয়া পথের ভিখারিণী হইয়াছেন। অন্য বিজিত-রাজরাণীর কথা দূরে থাকুক একদিন দেববালাগণও যাঁহার সেবা করিত, সেই মহীয়সী রমণী, আজি পর-পদ সেবিকা; সেই পূজ্যতমা আজি পর-মুখ প্রেক্ষিণী; সেই দেব-স্মরণীয়া, আজি পরানুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী; সেই হাস্যমুখী আজি রোদন পরায়ণা; হা ধিক! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, লিখিতে লেখনী অগ্রসর হয় না। যে জননীর আর্য্য নামধারী অসংখ্য পুত্র বর্ত্তমান, তাঁহার ঈদৃশী দশা, ইহা কি ঘৃণ্য কাপুরুষ সন্তানগণের কলঙ্ক নয়? ভাই সকল! জাগ্রত হউন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কুৎসিত দেশাচার সকলের মস্তকে পদার্পণ করিয়া উন্নতি সোপানে আরোহণ জন্য বদ্ধপরিকর হউন। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হউন। কিছু দিন এইরূপ চেষ্টা করুন তৎপরেই দেখিতে পাইবেন, ভারতের সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই নক্ষত্রপুঞ্জ, সেই প্রভাব, সেই শ্রী, সেই সেই শৌর্য্য-বীর্য্য আবার আসিয়া দেখা দিবে। আবার আপনাদিগের নির্ম্মল যশশ্চন্দ্র সমুদিত হইয়া বিমল-কিরণে জগৎ বিমোহিত করিবে। আবার প্রতাপ-মার্ত্তণ্ড আবির্ভূত হইয়া শত্রু শরীর দগ্ধ করতঃ আপনাদের মহিমা ঘোষণা করিবে।”

পাঠক!—কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়াছি, চলুন, একবার লম্পট-শরতের কার্য্যাবলী দর্শন করি। সুরেন্দ্রের বালবিধবা দ্বাদশবর্ষ-বয়স্কা ভগিনী ইন্দুমতী সৌন্দর্য্য-শোভার পূর্ণামূর্ত্তি, সিতাষ্টমীর শশি-কলা; সাক্ষাৎ কমলার অবতার; সৃষ্টিকর্ত্তা মনে মনে এই কন্যা-ললাম নির্ম্মাণ করিয়া আপনার নির্ম্মাণ কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া-

ছেন। এ রমণী একবার নয়ন-পথে পতিত হইলে, চিরকালের জন্য হৃদয়-ভবনে বিরাজিত থাকেন। ভুলিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করুন, কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না। ইন্দুমতীর শরীরে যৌবনের চিহ্ন নাই, কেবল আভাস মাত্রে অলঙ্কৃতা, এ-রমণী পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিলে যে কিরূপ মনোমোহিনী হইবেন, তাহা লিখিতে লেখনী অসমর্থ; কি তরলায়ত চক্ষু! কি নব-বিকশিত-নলিনী-সদৃশ মুখখানি! কি সুদীর্ঘ-নব-নীরদ-বিনিন্দিত-অরাল-কেশধাম! কি সুন্দর কপাল-ফলক! কি আবক্র যোড়া ভ্রূযুগল! কি নধর-নবীন-অঙ্গযষ্টি! ইন্দুমতীর যে অঙ্গেই দৃষ্টিপাত করুন, সেই অঙ্গই আপনাকে সন্তোষমিশ্র বিস্ময় সমুদ্রে নিমগ্ন করিবে।

দুরাচার শরৎ; এই অবলা পবিত্রান্তঃকরণা বালিকার পবিত্র সতীত্ব-রত্ন হরণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; অনেক দিন ধরিয়া কত কল্‌কৌশল প্রকাশ করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল ফলিল না। সরলা বালিকা তাহার কিছুই বুঝেন না, দাদার বন্ধুকে দাদা বলিয়া পবিত্রভাবে হাসিতে হাসিতে নিকটে আসেন, হাসিভরা মুখখানিতে, হাসিমাখা আদরের কথা বলেন। হাসি হাসি ভাবে শরতের হাত ধরিয়া এ দাও ও দাও বলেন। হাসি হাসি মুখখানিতে সেই আয়ত-নয়ন-যুগলের এক একবার অযত্ন সম্ভূত চটুলতা প্রকাশ পায়, তাহা দেখিয়া শুনিয়া পাপাত্মা শরতের পাপ-হৃদয় ধৈর্য্য হারাইল। নীচান্তঃকরণ, নীচতা প্রকাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। দুরাচার আপনার দুষ্প্রবৃত্তি সকলের বিশেষ বশীভূত হইল। চতুর্দ্দিক্ ইন্দুমতীময়ী দেখিতে লাগিল।

লাম্পট্য ভয়ানক দোষ, যে ব্যক্তি লম্পট তাহার তুল্য ঘোর নারকী জগতে অতি বিরল; যে নরাধম আপনার দুশ্চরিত্রতা দোষে পবিত্র-রমণীর সতীত্ব নাশ করিয়াছে, তাহার সহিত কোন পাপীর তুলনা হয় না। লম্পট নরাধম, যাহার সতীত্ব নষ্ট করে, তাহাকে এ জন্মের মত

কলঙ্ক-সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। তাহার মনের সুখ, সমস্ত জীবনের জন্য অন্তর্হিত হয়। তাহার হৃদয়, অসহ্য যন্ত্রণারূপ দাবানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে এবং সে স্বয়ং এ জীবনের মত বিধবা হইলে আত্মবন্ধুর আর সধবা হইলে প্রিয়পতির দুই চক্ষের শূল স্বরূপা হয়। দুরাচার লম্পট, এই ঘৃণিত কার্য্য দ্বারা কামিনীর পিতৃ ও শ্বশুর কুলকে দুরপনেয় কলঙ্ক-পঙ্কে লিপ্ত করে এবং হতভাগিনীর প্রিয়পতির পবিত্র হৃদয়ে যে মারাত্মক হলাহল ঢালিয়া দেয়, সেই নিদারুণ বিষাদ-বিষ; দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তাহার কান্ত-পুষ্ট-দেহকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। মরিলেও চিতা-গ্নিতে তাহার সে দুঃখ ভস্মীভূত হয় না। যে নরাধম লম্পট দ্বারা, এই-রূপ অসহ্য যন্ত্রণা পরম্পরা সমুৎপন্ন হয়, ঈশ্বর তাহাকে যে কি গুরুতর দণ্ড প্রদান করেন, তাহা আমি মানবীয় বুদ্ধিতে প্রকাশ করিতে অক্ষম। তাহার পাপের ক্ষয় নাই, তাহার নরকের অন্ত নাই, তাহার দুর্দশার ইয়ত্তা নাই, তাহার মনঃকষ্টের অবসান নাই, এবং কোন কালেই তাহার মুক্তির উপায় নাই। সাধু ব্যক্তি সকল তাহার মুখ দেখিতে ঘৃণা বোধ করেন। পৃথিবী তাহার পাপ-ভার বহনে অসমর্থ হয়েন। দুরাত্মা লম্পট, সতীত্বনাশ কালে, "আমারও ভগিনী এবং স্ত্রী আছে, অন্যে ইহার প্রতিশোধ লইতে পারে," ইহা যদি এক একবার মনে করে, তাহা হইলে বোধ হয়, এতাদৃশ গুরুতর পাপকর্ম্মে তাহার প্রবৃত্তি হয় না।

কমলাকান্ত কুসুমকে একটি বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে অনেকগুলি সেবক-সেবিকা অবস্থান করিয়া থাকে। সকলেই কুসুমের বিশেষ অনুগত। এক দিন কমলাকান্ত, কুসুমকুমারীর গৃহে আমোদ প্রমোদ করিবার নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাদ্যা-দির আয়োজন করিলেন। কুসুমকুমারীর বাসগৃহটি, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন এবং সুধাধবলিত; গৃহভিত্তিতে রুচি এবং অরুচিকর অনেকগুলি প্রতি-মূর্ত্তি লম্বিত আছে। মধ্যে মধ্যে কাচনির্ম্মিত নানাবিধ আলোকাধার;

ঊর্দ্ধে কয়েকটি কাচের ঝাড় প্রলম্বিত ; সমস্ত মেজেটি মূল্যবান সুচিক্কণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, তাহার এক পার্শ্বে অত্যাশ্চর্য্য-কারুকার্য্য-সম্বলিত মনোনয়নের প্রীতিপ্রদ-পর্য্যঙ্ক : তদুপরি সার্দ্ধহস্ত পরিমিত স্থিতি-স্থাপক গুণোপেত-দুগ্ধ-ফেণনিভ-সুকোমল-শয্যা বিরাজিত ; তদুপরি মশকারি সংযুক্ত চন্দ্রাতপ, মধ্যভাগে প্রলম্বিত একখানি ক্ষুদ্র টানা পাখা। অপরপার্শ্বে বসিবার স্থান, তাহার একদিকে একখানি বৃহৎ আদর্শ স্থাপিত, অন্য দুই দিকের ভিত্তিমূল, উপাধান সারিতে সুশোভিত, গৃহ মধ্যে বিলাসদ্রব্যের অভাব নাই। কমলাকান্ত, নিজ ধন দ্বারা এ-সমস্তই কুসুমকে আনাইয়া দিয়াছেন। অদ্য বিশেষ আমোদের দিন, বন্ধুবর্গ আসিবেন, মদ্যপান করিবেন, নৃত্য গীতাদির অভিনয় হইবে। হৃদয়-হারিণী কুসুম, বেশ-ভূষায় অলঙ্কৃত হইল। অত্যাশ্চর্য্য কারু-কার্য্য-সম্বলিত-কাচলী দ্বারা কুচযুগল আবৃত করিল, বিচিত্র বারানসী-বসন, নিতম্বে ফের দিয়া একটুকু বিশেষ বাহার করিয়া পরিধান করিল। নব-নীরদ-সদৃশ সুদীর্ঘ-কেশদামে, নিপুণতার সহিত কবরী বন্ধন করিল এবং তাহাতে ভ্রমর-ভ্রমরীর আকৃতি বিশিষ্ট নানাবিধ হীরক-খচিত-স্বর্ণ ফুল, এবং স্বর্ণ-কঙ্কতিকা বসাইয়া দিল। নাসিকার অগ্রে বহুমূল্য-নোলক পরিধান করিল। কণ্ঠ, কর্ণ, বাহু, মণিবন্ধ, নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গ সকলকে হীরক-খচিত-স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা মনের মত করিয়া সাজাইল। চরণে রৌপ্য নির্ম্মিত বিবিধ ভূষণ পরিধান করিল। চরণদ্বয়ে মলচতুষ্টয় চরণ-ছলে মুখরিত হইতে লাগিল। আলোহিত অধরোষ্ঠকে তাম্বুলরাগে অধিকতর আলোহিত করিল। কমলাকান্ত, প্রাণকান্তার রূপমাধুরী দর্শনে আনন্দ সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। অসার সংসারে বারনারীই সার বস্তু বলিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। কুসুমের চরণ-যুগলের আরাধনাই সকল কর্ম্মের সার মনে করিলেন। কুসুমকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই পিতৃপুরুষ সন্তুষ্ট হইবেন, মীমাংসায় স্থির করিলেন। কুসুম, সেবায় সন্তুষ্ট হইলেই শালগ্রাম-

শিলা-সেবার ফল ফলিবে বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন। কুসুমের এ মনোমোহিনী মাধুরীর নিকটে সরোজবাসিনী কোথায় লাগে বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। কুসুমকে হৃদয়ে ধারণ করিবার নিমিত্ত, সরোজবাসিনীকে ত্যাগ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, এ-সুখের সহিত তুলনা করিলে সে পাপ, পাপ মধ্যেই গণ্য নহে, ইহা ধ্যান করিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। ক্রমে ভৃত্য এক এক করিয়া খাদ্য সামগ্রী সকল গৃহ মধ্যে রাখিয়া গেল। কুসুম স্বহস্তে সে সকল সাজাইতে লাগিল। উত্তম বিছানার উপর সুপক্ক কুক্কুট-চরণ উত্তম ডিমে শোভা পাইতে লাগিল। তৎপার্শ্বেই প্রশস্ত কাচপাত্রে ছাগমাংস, সুরক্ষিত হইয়া সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। তৎপার্শ্বে পলাণ্ডু মিশ্র ভর্জ্জিত হংসডিম্ব, মৃত্তিকা পাত্র আলো করিয়া রহিল। তাহার নিকটেই কর্কটদম্পতী হতপ্রাণ হইয়া সুগন্ধি মশলায় সুপক্ব হওত মাতাল মহাপ্রভুর আগমন পথ চাহিয়া থাকিল। তন্নিকটেই কুক্কুট কাবাব, মণ্ডজিহ্বা, খাট্টা সকল, সুরাপায়ী কখন আসিবে বলিয়া আগমনপথ চাহিয়া থাকিল। অন্যান্য বিবিধ ভর্জ্জিত দ্রব্য, কুণ্ডলিত-লেজ মহাত্মা চিঙ্গড়ী মহাশয়ের সহিত, বারুণী সেবীর আগমন অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত-ভাবে কালযাপন করিতে লাগিল। তৎপার্শ্বে "মা ভবানী" সেরী, স্যাম্পিন্, ব্রাণ্ডি, ওল্টম্, রোজলিকার, এক্সা এবং রমরূপে বোতলমধ্যে অবস্থান করিয়া ভক্ত-সেবকের আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সোডাওয়াটার, লিমোনেড এবং বরফ সকল বসিয়া রহিলেন। মাতালের প্রেমে বরফ মহাশয় অন্তরে অন্তরে গলিতে লাগিলেন। হুঁকা, আলবোলা, তামাকু সকল, বসিয়া বসিয়া জ্বালাতন হইতে লাগিল। অগ্ন্যাধারে অগ্নি, নিমন্ত্রিতের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া ক্রোধে গন্ গন্ করিতে লাগিল। আতর, গোলাপ জল, লেবেণ্ডার এবং বিবিধ কুসুম সকল, কখন্ শিরে চড়িবেন, তাহার সময়ের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিল। ক্রমে ক্রমে কমলাকান্তের বন্ধুবর্গ আসিয়া উপ-

ন্বিত হইল। গৃহ মধ্যে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শুভস্য শীঘ্রং বলিয়া, সকলে সেখায় বসিল। চষক-চক্রে রমণীই প্রধান সেবক্তা—এই ভাবে কমলাকান্ত, কাচপাত্রস্থ লিমোনেড মিশ্রিত মদ্য অগ্রে কুসুমকুমারীকেই প্রদান করিলেন। কুসুম অর্দ্ধেক পান করিয়া অর্দ্ধেক প্রসাদ পাত্রে রাখিয়া দিয়া বারুণীর তীব্রতেজ-প্রভাবে বানরীর ন্যায় মুখভঙ্গি করিতে লাগিল। রাম বাবু সুরাপাত্র গ্রহণ করিয়া পরিচারক কমলকে দিল। কিরণমালী বাবু রুমাল দিয়া কুসুমের মুখ মুছাইল। রাধু বাবু ব্যস্ততার সহিত পাত্রস্থ কুক্কুট-চরণ রমণীর মুখে ধরিল। কুসুম এক কামড়ে তাহার অর্দ্ধেক গ্রাস করিল। অপরার্দ্ধ প্রসাদ পূর্ব্বস্থিত পাত্রে থাকিয়া বন্ধুবর্গের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কমলাকান্ত পুনর্ব্বার কাচপাত্রে মদ্য ঢালিলেন এবং লিমোনেড মিশ্রিত করিয়া নিমন্ত্রিত অনেক বন্ধুর হস্তে পানার্থ প্রদান করিলেন। এইরূপে পান চলিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে খাদ্যাদি অন্তর্হিত হইতে লাগিল। মা-ভবানী,বোতলাধার পরিত্যাগ করিয়া চর্ম্মাধারে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। এ-দিকে বন্ধুবর্গের মত্ততাও দেখা দিল। গানবাদ্য রঙ্গরস চলিতে লাগিল। আতর, গোলাপ জল, ফুল্ ও চাট্ সকল গৃহ-তলে ছড়াছড়ি হইতে লাগিল। বিকট হাস্যে, উৎকট চিৎকারে, ভয়ানক তালধ্বনিতে, গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কুসুম উত্থিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। বন্ধু সকলও সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিল। পদধ্বনিতে গৃহ-তল কম্পিত হইতে লাগিল। আবার সকলে উপবেশন করিল। পুনর্ব্বার পান আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে সকলেই বিশেষ মত্ত হইল এবং এই অবসরে শরৎচন্দ্র রাধুর সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া নিজ বিষয়ে সদর্পে বক্তৃতা আরম্ভ করিল।

দেখ রাধু তোমার আমায় অনেক অন্তর। তোমার সহিত আমার তুলনা করিলে,গোষ্পদের সহিত সাগরের তুলনা করা হয়। আমি বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন-মানে তোমা অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ; আমি যেস্থানে পদার্পণ

করি, সেস্থান পবিত্র হয়। আমাকে কত শ্যালা কন্যা প্রদান করিয়া আপনার উচ্চ কুলগৌরব রক্ষা করিয়াছে। কি ইংরাজী কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা সকল ভাষাতেই আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। আমার তুল্য গুণবান পুত্রে পৃথিবী গৌরববতী আমার সহিত তোমার সাবধানে কথা কহা উচিত। আমি, বাঙ্গালা ভাষার এম্ এ, আমার সহিত তুমি সাবধানে কথাবার্ত্তা কহিবে। শরতের বক্তৃতা শেষ না হইতে হইতে চষক-চক্রস্থ যোগীশ কহিল—"মা ভগবতি শরচ্চন্দ্রে"! একটুকু স্থির হও। তোমার বিদ্যা বুদ্ধি আমার অগোচর নাই। মা বাঙ্গালা ভাষার এম্ এ, একবার স্থির হও, তোমার কুলমর্য্যাদা আমি বিলক্ষণ জানি। জায়াজীব! তোমার ধন সম্পত্তি, তোমার স্ত্রীগণেতেই প্রকাশিত আছে। মা অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি! অহঙ্কার ত্যাগ কর। পৃথিবীতে পা দিয়া চল, তোমার মূর্খতায় সর্ব্বনাশ হইল। তুমি পৃথিবীর কণ্টক-স্বরূপ, নরকের দ্বারপাল স্বরূপ, অশ্রদ্ধার আস্পদ স্বরূপ, পাপের ভিত্তি স্বরূপ, তোমার নাম গ্রহণ করিলে পাপ সঞ্চয় হয়। তুমি জগতের ভয়ানক অনিষ্টকারী, নিজ দারার পরম শত্রু, অনেক বিবাহ করিয়াছ সত্য, কিন্তু বিবাহের ক্রিয়া নাই, তোমার স্ত্রীগণ, নাথ থাকিতে অনাথিনী, সহায় থাকিতেও কাঙ্গালিনী, অধিক কি পতি থাকিতেও কলঙ্কিনী। ভাই বাঙ্গালা ভাষার এম্ এ, তুমি যদি পৃথিবীতে না আসিতে, তাহা হইলে পাপস্রোতঃ এত বৃদ্ধি পাইত না। নরাধম! মরিলেও তোমার নিষ্কৃতি নাই। যমরাজ, তোমার নিমিত্ত রৌরব নরকের সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন। নূতন বিষ্ঠায় তাহা পূর্ণ করাইতেছেন। পাঁচুমকোজিম্ ভাই বাঙ্গালা ভাষার এম্ এ শরৎ! আমার উপর রাগ করিও না, প্রকৃত বন্ধু; বন্ধুকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করে। তুমি নিরহঙ্কারী সদাশয় সাধু হও, আমরা দেখিয়া শুনিয়া সুখী হই।

ক্রমে বিবাদ গুরুতর হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সকলে পড়িয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিল। আবার পানারম্ভ হইল। সুরা দাও, সুরা

দাও শব্দ উঠিতে লাগিল। চাতুর্ব্বর্ণ্য জাতি একত্র বসিয়া সকল প্রকার কুখাদ্য ভক্ষণ করিয়া নরকস্থ হিন্দুধর্ম্মকে উদ্ধার করিতে লাগিল।

হায়! এই নরাধম কাপুরুষগণ আবার স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া চিৎকার করে। ইহারা আবার দেশের উন্নতি-জন্য কাতর হয়। ইহারা আবার ভারতের মঙ্গল কামনা করে। এই নরাধমগণের পুণ্য ফলেই ভারত উৎসন্ন হইল। ইহারা আবার জাতির বিচার এবং খাদ্যের বিচার করে। ইহারা আবার যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া পর-মস্তকে পদার্পণ করে। ইহারা আবার ব্রাহ্মণ্য দেখাইয়া বংশগৌরব প্রকাশ করে। ইহারা আবার শালগ্রামশিলা পূজা করিয়া গোঁড়া হিন্দু হইতে চাহে। ইহারাই আবার জাতিভেদ রহিত করিতে কাতর হয়। ইহারাই আবার বিধবা বিবাহের বিপক্ষে বক্তৃতা করে। পূজ্যতম স্বাধীন জাতির উৎকৃষ্ট-গুণ-গ্রহণে ইহাদের যত্ন থাকুক আর নাই থাকুক্ সমস্ত দোষগুলি অধিকার করিয়াছে। সুরা পান তন্মধ্যে একটি প্রধান দোষ; সুরা মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া পশুত্বকে প্রদান করে। সুরা, দেহক্ষয়, আয়ুঃক্ষয় এবং অর্থক্ষয় করিয়া সর্ব্বনাশ করে। সুরা, উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলকে, বর্জ্জিত করিয়া দিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে প্রশ্রয় দেয়। সুরা, কাল-ভুজঙ্গিনী; ইহা একবার যাহাকে দংশন করে, তাহার আর রক্ষা নাই। মারাত্মক কালকূট হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু সুরার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। মায়াবিনী পিশাচী সুরা, একবার যাহার মুখ-চুম্বন করিয়াছে, তাহার আর ভুলিবার উপায় নাই। রাক্ষসী অনুগতকে এতাদৃশ অকার্য্যে নিযুক্ত করে যে তাহার উল্লেখ করিলেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। ভারতের অধিকাংশ অনিষ্ট এক সুরা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। লোকে ইহার মোহিনী-মায়ায় এমনই বিমুগ্ধ যে, ইহার বিপক্ষে সহস্র কথা বলিলেও গ্রাহ্য যোগ্য হয় না। তাচ্ছল্য করিয়া উড়াইয়া দেয়। সুরা পানে জ্ঞান নষ্ট করিয়া মত্ত হওয়াপেক্ষা বিষ-ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট; একা সুরা

আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। কত শত ধনবানকে কাঙ্গাল করিল। কত শত সীমন্তিনীকে অনাথা করিয়া পথের ভিখারিণী করিল। কত শত শিশু-বালককে দুঃখের সমুদ্রে ভাসাইল। কে—এই ভয়ঙ্করী সুরা, স্বর্ণভূমি ভারতে আনয়ন করিল !! কাহারা, অন্নের পরিবর্ত্তে এই ভয়ঙ্কর বিষ আনিয়া দিতেছে। কাহারা এই বিষ-বিক্রয় দ্বারা পরের সর্ব্বনাশ করিয়া বিপুলার্থ অপহরণ করিতেছে। কাহারা এই বিষ দ্বারা আমা-দিগকে নিবীর্য্য করিয়া তুলিতেছে। কাহারা, সুরা-সহায়ে আমাদিগকে অধঃপাতে দিতেছে। ভাই মদ্যপ ! ভাই ভারতবাসিন্ ! একবার মনে মনে তাহাদিগকে চিন্তা করুন। একবার সেই নরাধমদিগের ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করুন, তাহা হইলেই সাবধানতা আপনি আসিয়া পড়িবে। ভাই মদ্যপ ! আর বিষ-পান দ্বারা শরীর নষ্ট করিও না। আর পবিত্র-আর্য্য নামে মসী ঢালিয়া দিও না। তোমার উপর অনেকগুলি গুরুতর-কার্য্যের ভার আছে। একবার মাতা ভারতভূমির মুখ চাও, একবার মায়ের নয়ন-নীর দর্শন কর। একবার মায়ের পবিত্র-পুত্র হইয়া কোলে উঠিতে যত্ন কর। একবার কাঙ্গালিনী মায়ের কষ্ট-নিবারণে সচেষ্ট হও। একবার আমাদের প্রতি সদয় হও। একবার "কর্ত্তব্য কর্ম্মের কি হইল বলিয়া" পরামর্শ জন্য একত্রিত হও। একবার কাপুরুষত্ব বিমোচনের প্রতিজ্ঞা কর। একবার পবিত্র আর্য্য-দেহে, পবিত্র অয়োভূষণ ধারণ করিয়া সুশোভিত হও। একবার পুত্র পৌত্রাদি সকলকে ঐ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত কর ! আমরা দেখিয়া আনন্দিত হই। যদি সুপথের পথিক হইয়া আমাদিগকে সঙ্গী কর, আগ্রহের সহিত তোমার সঙ্গী হইব। তোমার পবিত্র-চরণের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিব এবং তোমাকে দেবতা জ্ঞানে নিত্য নিত্য ভক্তি-পুষ্পে পূজা করিব। ভাই মদ্যপ ! ভয়ঙ্কর রাক্ষসের ন্যায় তোমার বেশ দর্শন করিয়া যে, আমার জ্ঞান হত হইল। নরাধম পিশাচ ! এ-বেশে এখন কোথায় যাইতেছ ? কাহার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত কুসুমের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছ ? দেখিয়া যে ভয়

হইতেছে। চরণে ধরি, ক্ষান্ত হও। এ-অবস্থায় কুসুমের গৃহই তোমার উত্তম স্থান। নরাধম-মদ্যপ! কিছুতেই নিবৃত্ত হইলে না? তোমার উদ্দেশ্য আমি জানি, এ নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চরণে ধরি, ক্ষান্ত হও।

কুসুমকুমারীর ঘরে আমোদ প্রমোদ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সকলে চলিয়া গেল। সুরেন্দ্র, কিরণমালীর সহিত তাহার উপপত্নী-গৃহে গমন করিল। পাপাত্মা শরৎ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ পাইয়া, ইন্দুমতীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল। কুসুমকুমারীর গৃহে কেবল কমলাকান্ত এবং বিপিন রহিয়া গেল। কমলাকান্ত, কুসুমকে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিলেও, বিপিনবিহারী পাপীয়সীর প্রণয়-পাত্র হইয়াছিল। বহুদিন হইতে উভয়ে মন্ত্রণা করিয়া আসিতেছিল, কিসে কমলাকান্তকে বিনষ্ট করিবে। আজি তাহার শুভ দিন পাইয়া, রাক্ষসী-কুসুমকুমারী, বিপিনের দ্বারা কমলাকান্তকে সুরার সহিত বিষ (মর্ফিয়া) খাওয়াইল। কমলাকান্ত চৈতন্য হারাইলে তাঁহাকে উভয়ে ধরাধরি করিয়া রাজ-পথ-প্রান্তঃস্থ একটী উদ্যানে ফেলিয়া দিয়া আসিল। পিশাচী কুসুমকুমারী, আজি কমলাকান্তকে প্রণয়ের বিশেষ পরিচয় দিল।

অদ্য কয়েক দিন হইল, সুরেন্দ্রের বৃদ্ধামাতা ব্যাধি-বশে মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা। রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে। একপার্শ্বে একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে। বালিকা ইন্দুমতী, মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন-নীরে বক্ষঃ ভাসাইতেছেন এবং দাদা কখন আসেন, এই ভাবিতেছেন আর দ্বারপানে চাহিতেছেন। গৃহদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত আছে। এ-দিকে মদ্যপ-সুরেন্দ্র মদ্য লইয়াই ব্যস্ত: হা বারুণি! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। যিনি দশ-মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া কঠোর-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রসব করিয়াছেন। যিনি বিষ্ঠা-মূত্রকে বিষ্ঠা-মূত্র—জ্ঞান না করিয়া পরম যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন। যিনি, স্তন-দুগ্ধ দ্বারা পুষ্টি-সাধন করিয়াছেন। যিনি, নিজ খাদ্য-বস্তু দ্বারা তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। যিনি, দুর্গতি-নাশিনী, যিনি,

বিপদুদ্ধারিণী, যিনি দেবীর দেবী, যিনি ঈশ্বরীর ঈশ্বরী, যিনি দয়াময়ীর দয়াময়ী, যিনি পরমারাধ্যা, যিনি ভবসমুদ্রে পারকর্ত্রী, সেই পরম-পূজনীয়া মাতা মহাশয়া মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা, আর নরাধম কুপুত্র-সুরেন্দ্র, সুরা লইয়াই ব্যস্ত; ধন্য রে বারুণি! তোর্ চরণে নমস্কার।

দুরাচার শরৎ, বারুণী-পানে মত্ত হইয়া চলিতে চলিতে মনের উৎসাহে, বিশেষ আগ্রহে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত, সুরেন্দ্রের গৃহ-পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাটী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং কেহ কোথায় নাই দেখিয়া আনন্দ-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিল। নারকী, ইন্দুমতীর শয়ন-গৃহে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত, তন্মধ্য দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিতেছে। নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে দ্বারের নিকট গমন করিয়া, অবকাশ মধ্য দিয়া দেখিল, গৃহ মধ্যে কেহ নাই। কেবল তাহার মানস-সরোবরের কমল-কলিকা-ইন্দুমতী একাকিনী আসীনা, তৎপার্শ্বে সুরেন্দ্রের মুমূর্ষু মাতা, বিগতচেতনা হইয়া দারুণ-ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। দেখিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইন্দুমতী চকিত হইয়া দেখেন, দাদা শরৎ; দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন। আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন দাদা! তুমি আসিলে আমার দাদা আসিল না? আজি মায়ের বড় ব্যামোহ বাড়িয়াছে। আজি মা বড় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। একবার দেখ দেখি, মা কেমন আছে। এই বলিয়া হাত ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া গেলেন। আবার কহিলেন, দাদা! আজি তুমি বড় মদ খাইয়াছ। তোমার মুখে বড় গন্ধ ছাড়িতেছে। শরৎ কহিল, ভয় নাই, সুরেন্দ্র কিছু বিলম্বে আসিবে, আমি মাকে দেখিতেছি, তুমি আমাকে একটুকু খাবার জল আর এক খিলি পান দাও, ইহা বলিয়া সুরেন্দ্রের মাতাকে দেখিতে দেখিতে ইন্দুমতীর মুখেন্দু দেখিতে লাগিল। ক্ষীণালোকে সে বদন সুধাকরের অপূর্ব্ব শোভা এবং সে আয়ত-নয়ন-যুগলের স্বভাবচাঞ্চল্য দর্শন করিয়া শরৎ বিমোহিত হইল, ধর্ম্মজ্ঞান হারাইল। দেহ হইতে

চৈতন্যকে দূর করিয়া দিল। ধৈর্য্য হারাইল। তাহাকে তদবস্থাগত অবলোকন করিয়া ইন্দুমতী কহিলেন, দাদা! মা কি ভাল নাই? তুমি স্থির হইয়া আমার মুখ-পানে চাহিয়া কেন? শরৎ কহিল, বেশ আছেন। তুমি, জল দাও। ইন্দুমতী কহিলেন, অধিক জল এখানে নাই। আমি পাকশালা হইতে লইয়া আসি, ইহা বলিয়া জলপাত্র হস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নরপিশাচ-শরচ্চন্দ্র, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বাহিরে আসিয়া, গমন পরায়ণা ইন্দুকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া নিকটে টানিয়া আনিল। উভয়ে উভয়কে সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইল। ইন্দু কহিলেন, দাদা! তুমি আসিয়া আমাকে ধরিলে কেন? আমি ভয় পাই নাই। আমাকে ছাড়িয়া দাও। তোমার নিমিত্ত খাবার জল লইয়া আসি। শরৎ কহিল, ইন্দু! একটী কথা বলিব। ইন্দু কহিলেন, কি কথা দাদা! মা কি আজি রাত্রিতেই মরিবে? তুমি কি কিছু জানিতে পারিয়াছ? তবে দাদাকে একবার, কোথায় আছে, শীঘ্র ডাকিয়া আন। আমি ততক্ষণ মায়ের কাছে বসিয়া বসিয়া, তাঁহার মুখখানি দেখি। কালি আর দেখিতে পাইব না। আজি সমস্ত রাত্রি বসিয়া বসিয়া এ-জন্মের শোধ দেখিয়া লই। দাদা! আমার কান্না আসিতেছে। মা-মরিলে আমার কি গতি হইবে? কে আমাকে যত্ন করিবে? শরৎ সময় বুঝিয়া কহিল, ইন্দু! কাঁদিও না। ভয় কি? আমি [illegible] যত্ন করিব। ইন্দু কহিলেন, দাদা! কি বলিবে বলিতেছিলে, বল। শরৎ কহিল, যে ভাল কথা, তুমি [illegible] ঢেকে রাখিবে। কাহাকেও বলিও না। ইন্দু কহিলেন, দাদা! ভাল কথা কাহাকেও বলিব না, কেন? ভাল কথাত সকলকে বলা যায়। শরৎ হাসিয়া কহিল, সে [illegible] লের বলা নহে, কেবল তোমার আর আমার নিমিত্ত। ইন্দু কহিলেন, [illegible] তবে কি কথা, বল। শরৎ কহিল তুমি আমায় ভাল বাস [illegible] কহিলেন বাসি। শরৎ কহিল, তবে আমি যে কাজ করিব তাহাতে তুমি রাগ করিবে না। ইন্দু কহিলেন, ভাল কাজ হইলে রাগ [illegible]

কেন ? শরৎ কহিল, রাগ করিবে না, তবে আমার এই সেই আজ কাজ,— ইহা বলিয়া সবলে বালিকার মুখ-চুম্বন করিল। ইন্দুমতীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল, ভাবিলেন, এ-কি সর্ব্বনাশ! আমার সুরেন্ দাদা ত এমন করিয়া মুখচুম্বন করে না। দাদা-ত এমন করিয়া কখন আদর করে না। এ আমার মুখে মুখ দিল কেন! রাম! রাম! মদের গন্ধে যে বমি আসিতে লাগিল। প্রকাশ্যে কহিলেন দাদা! ভগ্নীর মুখে কি মুখ দিতে আছে? কৈ আমার সুরেন দাদা ত কখন দেয় না। শরৎ কহিল, প্রিয়ে! আর দাদা বলিও না, এখন আমি তোমার পতি বা উপপতি, ইহা বলিয়া সবলে আবার মুখ চুম্বন করিল। তখন ইন্দুমতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে করিতে কদলী-দলের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন, এবং অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মাগো! বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। দুরাচার শরৎ, গতিক মন্দ দেখিয়া বস্ত্রাঞ্চলে ইন্দুমতীর মুখ-বন্ধন করিয়া বলপূর্ব্বক ভূমিতলে পাতিত করিল।

লেখনি! সাবধান, আর না, অনেক হইয়াছে। আর কেন অগ্রসর হইয়া "কালামুখী" নামের সার্থকতা সম্পন্ন করিতে উদ্যুক্ত হইতেছ? পৃথিবি! তুমি রসাতলে যাও। ধর্ম্ম! তুমি অন্তর্হিত হও। সাধুতা! তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। কলঙ্কীচন্দ্র! আর কেন কলঙ্কিত হও, এক বারে চির অস্তে গমন কর। পবন! তুমি আর অনিল-দানে জীবন রক্ষায় বিরত হও। সতী! সতীত্ব নাশ! স্মরণ করিলেও হৃদয় কম্পিত হয়। মস্তক ঘূর্ণিত হইতে থাকে। সংসার বিষময় বোধ হয়। ধর্ম্ম বৃথা বোধ। হা! মনুষ্য নামে ধিক্! ইহারাই আবার পৃথিবীর প্রধান জীব বলিয়া অহঙ্কার করে। ইহারাই আবার ধর্ম্ম, ধর্ম্ম করিয়া পথে পথে চিৎকার করে। ইহারাই আবার দেবত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে। ইহারাই আবার জ্ঞানী, মানী, বিচারক হইয়া, লোক স্থিতির জন্য যত্ন করে। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হইতে চলিল! হে

ইন্দ্রবজ্র! তুমি এই সময় একবার রাজদণ্ডের কার্য্য কর। দুরাচার শরতের মস্তকে পতিত হইয়া, তাহাকে শতধা বিদীর্ণ কর। কালসর্প! তুমি কোথায় আছ, একবার এই সময় আসিয়া দুরাচার শরতকে দংশন কর। ভগবন্ সূর্য্য! কোথায় আছেন, একবার এই সময় উদয় হইয়া, আপনার ইন্দুমতীকে রক্ষা করুন। পাপ-যামিনি! তুমি প্রভাতা হও। আর ক্ষণকালও থাকিও না। তোমার সহায়ে নারকী, কি অকার্য্য করিতে উদ্যত না হইয়াছে। সাধু সদাশয় মহাপুরুষগণ! জাগ্রত হও, আর নিদ্রিত থাকিও না। শরৎ তোমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! কোথায় যাই, কি করি, কিছুই উপায় দেখিতেছি না। হে ভগবন্! হে দয়াময়! হে সর্ব্বভূত-রক্ষক! হে দুর্ব্বলের বল! আপনি এ সময় কোথায়? একবার আগমন করিয়া আপনার ইন্দুমতীকে রক্ষা করুন। না হয়, ভূগর্ভ হইতে যুগপৎ সহস্র আগ্নেয়-গিরির উৎপত্তি করিয়া, পৃথিবীকে একেবারে দগ্ধ করুন। হায়! হায়! কি হইল, ঐ-সিতাষ্টমীর শশি-কলাকে, দারুণ রাহু গ্রাস করিল। উঃ কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা! হৃদয়! শতধা হও। চক্ষু! দর্শন শক্তি হারাও। অক্ষতযোনি-বালিকা, কিছুই জানেন না। সরলা সতী কখন পাপের মুখ দেখেন নাই। তাঁহার এ-কি অদ্ভুত যন্ত্রণা!—বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইবারও উপায় নাই, চিৎকার করিবারও পথ নাই। কেবল ধরাতলে পড়িয়া ছটফট্ করিতেছেন। উঃ কি অকথ্য ব্যাপার! কি ভয়ানক বল-প্রকাশ! বালিকা এইবার জীবন হারাইলেন। হা! রাক্ষসি শর্ব্বরি! এইবার তুমি, বালিকার অপবিত্রীভূত-শোণিত-প্রবাহ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হও। স্বকার্য্য সাধনের পর দুরাত্মা শরতের জ্ঞানোদয় হইল। সভয়ে মুখ-বন্ধন মুক্ত করিল। ইন্দুমতী চিৎকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্রের বাটীর পার্শ্বে, মাধব নামে এক সদাশয়ের বাটী; গ্রীষ্মপ্রযুক্ত এইমাত্র নিদ্রা-ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু-সেবনার্থ প্রাঙ্গনে পদ-চারণা করিতেছিলেন। সহসা রোদন-ধ্বনি শুনিয়া

তৎক্ষণাৎ সুরেন্দ্রের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। শরৎ, মাধবকে দেখিয়া বেগে পলায়ন করিল। পরে মাধব, গৃহ হইতে আলোক বাহির করিলেন। ইন্দুমতীর নিকটে আসিয়া তাঁহার রক্তাক্ত অঙ্গ-যষ্টি-অবলোকনে একবারে বিস্ময়ে সপ্তপাতাল-তলে গমন করিলেন। চিৎকার করিয়া অন্যান্য লোক জনকে ডাকিলেন। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আনাইয়া ইন্দুমতীকে বাঁচাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন এবং সুরেন্দ্রের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইয়া দিলেন।

কমলাকান্ত, গ্রামের এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি, শরচ্চন্দ্র তাহার সহচর, একারণ কমলাকান্তকেও আনিতে লোক পাঠাইলেন। কমলাকান্ত, গৃহে নাই। কুসুমের গৃহে অনুসন্ধান করা হইল, তথায়ও নাই। কমলাকান্তের আত্ম বন্ধুগণ, তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। নানা স্থান অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কোথাও পাইলেন না। রাজপথ ধরিয়া আসিতে আসিতে পথ-প্রান্তস্থ উদ্যান মধ্য হইতে একবারমাত্র মনুষ্যের আর্ত্তস্বর শুনিয়া সন্দিগ্ধমনে তথায় গমন করিয়া দেখেন, কমলাকান্ত মৃতবৎ পতিত রহিয়াছেন। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিলেন এবং বৈদ্য দিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। অন্যদিকে, মাধবের লোকও সুরেন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহাকে পথ-পার্শ্বস্থ-পয়ঃ-প্রণালীতে পতিত দেখিতে পাইল এবং অন্যান্যের সাহায্য পাইয়া তথা হইতে তুলিল। জল আনিয়া দেহের কর্দ্দম ধৌত করিয়া দিল এবং কোন রূপে গৃহে লইয়া চলিল। জলসংযোগে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ—সুরেন্দ্র গৃহে আসিয়া ভগিনীর অবস্থা অবলোকনে, এবং বৃত্তান্ত শ্রবণে দুঃখে, ক্রোধে, অপমানে আবার উন্মত্ত হইল। নরাধম শরৎ! চণ্ডাল শরৎ! নারকী শরৎ! মহাপাপী শরৎ! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্! আমি এই সর্ব্ব-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি আমি তোর্ বক্ষঃস্থ রক্ত পান না করি, তবে যেন আমার পিতৃ-পুরুষ নরকস্থ হয়। রে নরাধম! তুই আমার কি সর্ব্বনাশ না করিয়াছিস্! এই কথা বলিতে

বলিতে সজোরে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। পরে ইন্দুর নিকট গমন করিয়া কহিল—দিদি আমার! তুমি এখন কেমন আছ? আমার নয়নমণি! তোমার এ অবস্থা কে করিল? ভগিনি ইন্দু! তোমার মুখ-চন্দ্র যে ম্লান হইয়া গিয়াছে। তোমার নয়নের সে মাধুর্য্য কোথায় গেল। ইন্দু! ইন্দু! ভগিনি ইন্দু! সুরেন্দ্রের মধুর সম্ভাষে, মৃতপ্রায়া ইন্দুমতীর কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইল। শরীরে যেন বল পাইলেন। সুরেন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া, দাদা! দাদা! বলিয়া ক্ষীণস্বরে আহ্বান করিয়া নীরব হইলেন। দুই চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। সুরেন্ মুখ মুছাইয়া দিল। ইন্দু লজ্জাবনত মুখে কহিলেন, দাদা! পাপাত্মা শরৎ, এইরূপে আবার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইহা বলিয়া ক্ষীণস্বরে এক একটী করিয়া সকল কথা সর্ব্বসমক্ষে নিবেদন করিল। শান্তিরক্ষক প্রভৃতি রাজপুরুষগণ পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও সকল কথা শ্রবণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে শর্ব্বরী প্রভাত হইয়া গেল। চিকিৎসকগণ বসিয়া থাকিয়া নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শোণিত স্রোতঃ কোনরূপেই রুদ্ধ করিতে পারিলেন না। নাড়ী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার উপর আবার প্রবল জ্বরের উদয় হইল। দুই চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ভয়ানক-বিকার-প্রভাবে ইন্দুমতী অত্যন্ত প্রলাপিনী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে এই সংবাদ সমস্ত গ্রামে প্রচারিত হইল। গ্রামবাসী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ইন্দুমতীকে দেখিতে আসিল। গৃহ, লোকারণ্য হইয়া গেল। বিকারবলে ইন্দুমতী প্রলাপিনী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, দাদা শরৎ! আমি তোমার ভগিনী, ছি! কি কর, আমাকে ছাড়িয়া দাও। দাদা সুরেন শুনিলে, তোমাকে গালি দিবে, আর আমাকে কাটিয়া ফেলিবে। আমি, পাপ কর্ম্ম করিতে পারিব না। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ওগো! সুরেন দাদা গো! ওগো! আমি যাই গো! আমি যাই গো! মা কালী! মা দুর্গা! আমাকে বাঁচাও। শরৎ দাদার হাত হইতে

আমাকে বাঁচাও। হে হরি! হে ভগবান্! তোমরা আমাকে বাঁচাও, ওগো! শরৎ দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, আমার মুখ বাঁধিও না। আমাকে মাটিতে ফেলিও না,ও-মা! তোমার ইন্দুমতী যায় যে মা! ওগো! আমার বড় কষ্ট হইতেছে, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছাড়িয়া দাও, প্রাণ গেল, আমি মলেম, উঃ বুকফেটে যায়, শরৎ দাদা! আমি তোমার মা হই, আমায় ছাড়িয়া দাও। ছি! ছি! আমার এ-কি হইল। শরৎ! আর আমার মুখের বন্ধন খুলিও না। আর আমি এ-মুখ দেখাইব না। আমার গলায় পা দিয়া, আমাকে মারিয়া ফেল। সঙ্গিনীরা আমায় দেখিলে কি বলিবে? বৌ-য়েরা উপহাস করিবে। আমি কলঙ্কিনী হইয়াছি। আমার সতীত্ব খাইয়াছ, আমার জীবন নষ্ট করিয়া আমাকে বাঁচাও। দাদাকে আমি আর এ-মুখ দেখাইব না। পাপী শরৎ! নচ্ছার শরৎ! আমি যদি সতী হই, আমি যদি ফুল-জল-চন্দন দিয়া মা দুর্গার পূজা করিয়া থাকি, তবে তোর বুকের রক্ত আমার দাদা খাইবে। ধর্ম্ম তোর্ মাথায় মুগুর মারিবে। বলিতে বলিতে হাসিয়া উঠিলেন, আর কহিলেন, কেমন এখন পালাও দেখি, পালাও! ওরে যমদুত! শরৎ দাদাকে বেশ করিয়া ধর্, আচ্ছা হই-তেছে। খুব মুগুর মারিতেছ, ওগো সুরেন দাদা! কর কি, ছুরি দিয়া বুক চিরিয়াছ, শরৎ মরিয়াছে, সেই ভাল, বুকে মুখ দিয়া, মরা মানুষের রক্ত খাইও না, ছি-দাদা! তোমার মুখ-বুক দিয়া রক্তের ধারা পড়িতেছে। দাদা! আবার রক্ত খাইতে লাগিলে? পাপী শরৎকে টানিয়া ঐ গো-ভাগাড়ে ফেলিয়া দাও। আর রক্ত খাইও না। পর-ক্ষণে উঃ প্রাণ যায়, বড় পিপাসা, জল খাইব, জল—জল; বুক ফেটে গেল। একটুকু জল, দাদা! একটুকু জল, সুরেন্দ্র মুখে জল দিল। ইন্দুমতী জল পান করিয়া, কাসিতে হাসিতে মৃত পিতাকে দেখিতে পাইয়া, কেগা? বাবা, বাবা! তুমি আমাকে দেখিতে আসিয়াছ? বাবা! আমাকে একবার কোলে কর। বাবা! আমার বড় কষ্ট হই-

ভেছে। আর আমি দাদার কাছে থাকিব না। তোমার সঙ্গে যাইব। বাবা! তোমার সঙ্গে সোণার রথ কেন? রথে এত ফুল কেন? বাবা! তুমি কি স্বর্গে থাক? ঐ-সকল পুরুষ কি দেবতা? বাবা ঐ চামর হাতে মা-দুর্গার মত মেয়েগুলি কে? বাবা! ওঁদের হাতে চামর কেন? বাবা! তুমি হাসিতেছ কেন? ঐ রথ কি হবে বাবা? দৈববাণী হইল "তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইব, এজন্য পুষ্পক রথ আনিয়াছি। আর ঐ যে নবদূর্ব্বাদলশ্যামরূপ দর্শন করিতেছ, উনিই ভগবান হরি; আর ঐ যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী দুইটি দেখিতেছ, উহাঁরাই লক্ষ্মী এবং ইন্দ্রানী।" বাবা! তবে আমি তোমার সঙ্গে যাইব। আমায় রথে তোল; দৈববাণী হইল "এস", ইন্দুমতী কহিলেন বাবা! বেস রথ, হাঁ বাবা! আমাকে কোলে করিয়া মধ্যখানে যিনি বসিলেন ইনি কি লক্ষ্মীদেবী? দৈববাণী হইল "হাঁ মা।" বাবা! তবে চল আমরা যাই, এই বলিয়া ইন্দুমতী যেমন উত্থিত হইবার চেষ্টা করিলেন, অমনি প্রাণ বায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। সুরেন্ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, ইন্দুমতী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রোদন ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। সুরেন্দ্র, মা! মা! মা গো! আসিয়া দেখুন, আপনার ইন্দু আপনাকে পরিত্যাগ করিল। ইহা বলিয়া যেমন জননীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে উঠাইতে গেল। অমনি জানিতে পারিল তিনি অনেকক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গযষ্টি, যষ্টিবৎ পতিত হইয়া আছে। সুরেন্দ্র চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিল। পরে যথাবিধি, ইন্দুমতীর এবং জননীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, পুলিস কর্ম্মচারি সঙ্গে শরতের অনেক অনুসন্ধান করিল। কিন্তু কোথাও তাহার অনুসন্ধান পাইল না। শরৎ একবারে দেশত্যাগ করিয়াছে। তখন সুরেন্দ্র প্রতিজ্ঞা-পূরণ-মানসে শরতের অনুসন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ও-দিকে কমলাকান্ত, বহুকষ্টে বিযুক্ত হইয়া, বিপিন এবং কুসুমের নামে বিচারালয়ে

অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। যুবরাজ-বিনয়ের অধিকারে বিচার হইল। বিচারপতি, বিপিন এবং কুসুমকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা দিলেন। তাহারা উভয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে শরচ্চন্দ্রের স্ত্রী গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল এবং কালক্রমে কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়া হতশ্রী হওত অবশেষে এক মৃতচেলাপহারকের (মুর্দা-ফরাসের) মনোমোহিনী হইয়া শ্মশান ভূমিতে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিজয়পুরস্থ রাজান্তঃপুর।

অরিন্দম রাজার রাজ্যের নাম "এক" বা অদ্বিতীয় রাজ্য ছিল। বিনয় যে যুদ্ধে গমন করেন সেই যুদ্ধেই জয় লাভ করেন বলিয়া প্রজাগণ রাজ্যের নাম বিজয়স্থল, বিনয়ের নাম বিজয় এবং রাজধানীর নাম বিজয়পুর রাখিয়াছে। আমরাও আবশ্যক মত এই তিন নামের উল্লেখ করিয়া আসিতেছি এবং পরেও করিব। সরোজবাসিনী বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরস্থ বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। পতির শেষ পত্রখানি আবার দেখিতে বাসনা হওয়ায় কবরী হইতে বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। পত্র বাহির করিবার কালে কবরী শিথিল হওয়াতে তাহা উন্মুক্ত করিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরে কিরূপ অবস্থায় তথা হইতে গমন করিয়াছেন, তাহা পাঠক অবগত আছেন। সরোজবাসিনী গমন করিবার বহুক্ষণ পরে তাঁহার মাতা তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোথাও অনুসন্ধান না পাইয়া ভাবিলেন, সরোজ বাজবাটী গিয়াছে। তথায় গমন

করিয়া দেখিতে না পাইয়া গৃহে আসিলেন। স্বামীকে আহ্বান করিলেন এবং সরোজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। ভৈরবদেব অনেক স্থানে তত্ত্ব লইলেন কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান না পাইয়া গৃহিণীকে তৎ-সংবাদ প্রদান করিলেন। গৃহিণী চকিত হইয়া উঠিলেন এবং ভাবিলেন এ-কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিতেছি। প্রকাশ্যে কহিলেন, বলেন কি! কন্যা ত মন্দ স্বভাবের নহে। তাহার চরিত্র অতি নির্ম্মল। তবে সে কোথায় গমন করিল। কে আমার সর্ব্বনাশ করিল। স্বামিন্! আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, কন্যার "বয়সকাল" হইল, হয় জামাতাকে আনুন, নয় কন্যাকে জামাতৃ-গৃহে রাখিয়া আসুন। তখন আমার কোন কথাই শুনিলেন না। এখন দেখুন, কি সর্ব্বনাশ ঘটিল। মা দুর্গা রক্ষা করুন। মা কালী, লজ্জা নিবারণ করুন। আমার সরোজ ঘরে ফিরে আসুক। মা দুর্গা! আমি কখন পাপ কেমন তা জানি না, আমার গর্ভজাত কন্যা যেন পাপ-পথাবলম্বিনী না হয়। স্বামিন্! আর বসিয়া ভাবিলে কি হইবে, এই বেলা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করুন। ব্রাহ্মণ বহু অনুসন্ধান করিয়া সন্ধ্যা দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে এক পক্ষ গত হইয়া গেল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সরোজও অনেক গ্রাম নগরাদি অতিক্রম করিয়া সুদূরদেশে চলিয়া গেলেন। বিজয়পুর মধ্যে এই ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কত লোকে কত কথা বলিতে লাগিল। সরোজবাসিনীর পরিচারিণী গতিক মন্দ দেখিয়া কোন কথাই প্রকাশ করিল না।

কমলমালা, সরোজবাসিনীর সংসার ত্যাগে বিষম দুঃখিত হইলেন এবং এক দিন সুরলাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, সুরলে! সরোজ নিতান্তই গৃহত্যাগিনী হইয়াছে। প্রায় মাসেক হইল তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। আহা! ভাবিয়া ভাবিয়া সরোজের মায়ের মুখখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে বড় দুঃখ হয়। গৃহত্যাগিনী করিল কি; কিন্তু সুরলে! আমি বেশ জানি,

সরোজের স্বভাব অতি নির্ম্মল; সে প্রাণান্তেও অসৎ-পথে পদার্পণ করিবে না। সূর্য্য যদি পশ্চিমে উদয় হয়, সমুদ্র যদি শুষ্ক হইয়া যায়, অগ্নি যদি দাহিকা শক্তি ত্যাগ করে, খল যদি পবিত্র হয়, সুমেরু যদি মক্ষিকার বহনযোগ্য হয়, রতি যদি পতি ছাড়ে, সাবিত্রী যদি বিধবা হয়, পৃথিবী যদি সহ্যগুণ ছাড়ে, তাহা হইলেও সরোজ সতীত্ব ছাড়িবার নহে। সে বড় শক্ত মেয়ে; ইহার ভিতর কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। অনেক দিন হইল, আমি সরোজকে পত্র লিখিতে বলি, বোধ করি সে তাহার স্বামীকে পত্র লিখিয়াছিল। কমলাকান্ত পত্র পাইয়া কোনরূপ অনাদর প্রকাশ করিয়াছেন। সরোজ বড় অভিমানিনী, মনের অভিমানে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছে। ইহাই নিশ্চয়; না যদি হয় ত আর আমি বলি কি; মুরলা কহিলেন, আমারও ইহাই বোধ হয়। কারণ, সরোজবাসিনী সতী পতিব্রতা, রমণীকুলের শিরোমণি; আমি কখন তাহার উচ্চহাস্য বা ঊর্দ্ধদৃষ্টি দেখি নাই, সে মেয়ে সামান্য মেয়ে নয়, তাহার সকলই সুলক্ষণ। যাহাই হউক, বড় দুঃখের কথা। সরোজের মায়ের মুখপানে চাওয়া যায় না। এই কথা বলিতে বলিতে মুরলার চক্ষে জল আসিল। তাহা দেখিয়া, রত্নমালা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং নির্ব্বোধ পুরুষগণকে কত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এমন সময় নগেন্ বাবু বা নগু বাবু হেলিতে দুলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মাতার চক্ষে জল দেখিয়া কহিতে লাগিল, "মা অত্নমালা। তুই কাঁদ্‌চিস্ কেনে? উরলা মা তুই তাপোর্ দিয়ে মুকঢাকা দিয়ে কেন্দে? কি হয়েছে? আমায় বিন্দুবেত্তা বোকেচে? বল্‌না উরলা মা যদি চট্ ক'রে কথা না কও, তবে আমি তোমার বাবা হ'ব না; মা অত্নমালা, আর কেঁদো না, আর কেঁদোনা। আমি বিন্দু বেত্তাকে বোক্‌বো, তুমি কেঁদোনা, এসো। মুক মুচ্‌য়ে দি" এই কথা বলিয়া নব-বিকশিত-কোকনদ-দল-সদৃশ-কচি কচি-করদ্বয় দ্বারা একবার রত্নমালার এবং একবার মুরলার মুখ মুছাইতে

লাগিল। মুরলা তৎক্ষণাৎ কোমল করযুগল ধারণ করিয়া “এস বাপ আমার এস” ! বলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন এবং বদন সুধাকরে কয়েক-বার চুম্ব দিলেন। তৎপরে উভয়ে সত্বর রোদন নিবারণ করিয়া সাবধান হইলেন। এই অবকাশে নগেন্ কহিল, না আমি তোমার বাবা হ’ব না, অম্বমালা আগ্ ক’রবে। আমি বিহু আজার বাবা হ’ব। বিহুর মা সেই আণ্ডা বুইই আমার বৌ হ’বে। মুরলা কহিলেন, তবে তুমি আমার শ্বশুর হইলে। না, তা হ’ব না, এই আমি তোমার ছছুরের ছম্মন্দি হ’ব। উভয়ে শুনিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। মুরলা কহিলেন, আচ্ছা, তাই ভাল। রত্নমালা কহিলেন, বাবা নগেন্! মুরলা তোমার কে হয় বাবা। ত্যান বৌ মা; আর তুমি ছুছুমা; মুরলা কহিলেন, নগু বাবু! আমাকে ছুছুমা বলিবে না? মা যে আগ ক’র্বে; বাবা যে বোক্‌বে; মুরলা হাসিতে হাসিতে রত্নমালাকে লক্ষ্য করিয়া নগেন্‌কে কহিলেন, তোমার বাবা এখন আমায় পাইলে ত বাঁচিয়া যান, আবার নূতন রস, নূতন কথা; নূতন প্রণয়; কেবল তোমার মায়ের ভয়ই ভয় বটে, আচ্ছা নগেন্! তোমার মাকে একবার আমার বদলে বৌমা বল’ দেখি। মা, বদলে বৌমা হ’বে না, ছুছু বৌমা হ্বে। মুরলা কহিলেন কেমন লোকের ছেলে; পাকা পোক্ত; কাঁচে পা দিতে চায় না। উভয়ে নগেন্‌কে লইয়া এইরূপ কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে পরিচারিণী আসিয়া সংবাদ দিল দেবি! যুবরাজ আসিয়া আপ-নাকে অনুসন্ধান করিতেছেন। মুরলা ব্যস্ত সমস্তে যুবরাজের নিকট উপ-স্থিত হইয়া, স্বামিন্! মুরলা শ্রীচরণে প্রণতা, অসময়ে দাসীর মন্দিরে পদার্পণ কি জন্য বলুন দেখি? আজি আমার কি ভাগ্য! যুবরাজ কহি-লেন, আমি একটি দ্রব্য হারাইয়াছি, তাহার অভাবে রাজকার্য্য করিতে পারিতেছি না, তাহারই অনুসন্ধানে তোমার নিকটে আসিয়াছি। তুমি কি তাহা পাইয়াছ? মুরলা কহিলেন, অগ্রে জিনীষের নাম করুন; পশ্চাৎ পাওয়া না পাওয়া নিবেদন করিব। যুবরাজ কহিলেন, যে

দ্রব্য আমার মন ; মুরলা কহিলেন, স্বামিন্! আমি তাহা আমার বিবাহ-রাত্রে পাইয়াছিলাম বটে এবং অনেক দিন আমার নিকটেও ছিল, কিন্তু অদ্য কয়েক দিন, আমার সেই জীবন-যৌবন-প্রেম-বিনিময়ের বস্তুটি, রত্নমালা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। আমি আপত্তি করায়, সে কহিল, তুমি যাহা দিয়া পাইয়াছ, আমিও তাহাই দিয়াছি, তবে কেন একা তোমার নিকটে থাকিবে, আমাকে আমার বস্তু দাও, ইহা বলিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে অনুসন্ধান করুন, পাইবেন। যুবরাজ কহিলেন চোরেরাই অন্যের উপর দোষার্পণ করিয়া স্বয়ং সাধ হইতে চেষ্টা পায়, আমি তোমার আর কোন কথা শুনিতে চাহি না, আর তোমার এ অপরাধ ক্ষমাও করিব না। অবশ্যই দণ্ড দিব, ইহা বলিয়া, মুরলাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া সবলে মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, দাও, আমার মন ফিরে দাও, না দাও আবার দণ্ড দিব। মুরলা কহিলেন, আমি ভগবান্ ভাস্করকে সাক্ষী রাখিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ফিরে দেওয়া দূরে থাকুক যাহাতে জন্ম জন্ম এইরূপ বস্তু মরণান্ত পর্য্যন্ত অপহৃত করিয়া রাখিতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা পাইব, এবস্তুর জন্য যদি আমাকে পঞ্চতপা করিতে হয়, যদি আমাকে স্বহস্তে মস্তক খণ্ডিত করিয়া অনলে আহুতি দিতে হয়, যদি আমাকে সংসারচক্রে যুগযুগান্ত নিষ্পিষ্ট হইতে হয়, যদি আমাকে মাতা-পিতা পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি আমাকে সোদর স্নেহে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহাতেও আমি কাতর হইব না। যুবরাজ কহিলেন, আমিও এরূপ চোরকে এইরূপ দণ্ড দিতে বড় ভাল বাসী। মুরলা কহিলেন, কি জন্য আগমন, এখনও বলিলেন না? যদি না বলেন তবে আমি এখনই কোলে উঠিয়া বসিব। যুবরাজ কহিলেন, এ বড় গুরুতর দণ্ড, তবে দণ্ড না পাইলে আমি বলিব না। এই বলিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, মুরলা স্বামীর অঙ্কে বসিয়া বাহুবল্লীদ্বারা গলদেশ বেষ্টন করিলেন। পরে যুবরাজ কহিতে লাগিলেন। কল্য রত্নমালা শ্বশুর-গৃহে যাইবেন; তথা হইতে

সংবাদ লইয়া দূত আসিয়াছে। অতএব গমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া দিবে এবং রত্নমালাকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে কহিবে, তোমায় এই সংবাদ প্রদান করিতে আসিয়াছি, ইহা বলিয়া যুবরাজ গমন করিলেন। পর দিন যথাকালে রত্নমালা স্বামীসহ মহাসমারোহে শ্বশুর-গৃহে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কমলাকান্ত।

এত দিনের পর কমলাকান্তের চৈতন্য হইল। দিব্যজ্ঞানে এবং দিব্য চক্ষে নিজ পাপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। নিদারুণ অন্তর্দাহে অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতে লাগিল। সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিলেন। বেশ্যার প্রণয়ের সুখ বিলক্ষণরূপে বুঝিয়া লইলেন। বালিকা সরোজবাসিনীকে মনে পড়িল। মনঃপ্রাণ ভয়ানকরূপে আকুঞ্চিত এবং নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমার পূর্ব্ব-প্রেরিত-পত্রগুলি বাহির করিলেন এবং তাহা সজল-নয়নে পাঠ করিতে করিতে জ্ঞান হারাইলেন। তৎপরে চৈতন্যান্তে বিলাপ আরম্ভ করিলেন। প্রিয়তমে! হৃদয়হারিণি! আমার হৃদয়-সরসের সরোজিনি-সরোজবাসিনী! আমায় ক্ষমা কর। এ-হতভাগ্য পাপী নারকীকে ক্ষমা কর। তুমি এ-নরাধমকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ, একবার নিকটে আসিয়া বাক্যসুধা দানে বাঁচাও। সতীকুল-গৌরব-পালিকে! হতভাগ্য কমলাকান্ত যায়; আসিয়া রক্ষা কর। সতীনারী, কখন পতির দোষ গ্রহণ করেন না,

আমি সহস্র অপরাধে অপরাধী; আমায় ক্ষমা কর। আমি উদ্দেশে চরণে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, আমায় ক্ষমা কর। প্রিয়ে! আমার দুর্ব্বাক্যবাণে ব্যথিত হইয়া কতই রোদন করিয়াছ, এস! একবার হস্ত দ্বারা নয়ন-নীর মুছাইয়া দিয়া, আদরে বক্ষে ধারণ করি। জীবিতে-শ্বরি! আমি তোমার মহিমা-পরিজ্ঞানে অন্ধ হইয়া কি দুষ্কার্য্যই করি-য়াছি। প্রাণেশ্বরি! তুমি কি জীবিত আছ? না, এই পাপ-সঙ্কুলা-পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছ? আসিয়া দর্শন কর, কমলা বিনা কমলাকান্তের কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে। প্রিয়ে! আমি প্রতি রাত্রিতে স্বপ্নযোগে তোমার সন্ন্যাসিনীর বেশ দর্শন করিয়া থাকি। তুমি আমার জীবিতা আছ। দয়া করিয়া দর্শন দিয়া আমাকে রক্ষা কর। তোমার অদর্শনে আমি মৃত প্রায় হইয়াছি। আমার জীবিত-প্রয়োজন-পর্য্যবসিত হইয়াছে। হা প্রিয়ে সরোজবাসিনি! হা প্রিয়-তমে! হা পতিব্রতে! আজি কমলাকান্ত, তোমার অভাবে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিল। এই কথা বলিতে বলিতে উত্থিত হইলেন। বহুযত্নে উত্তম স্থানে পত্রগুলি রাখিয়া দিলেন। বহুমুল্য পরিধৃত বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিলেন। বিলাস দ্রব্য সকল বিতরণ করিলেন। হবিষ্যান্ন ভোজী একাহারী হইলেন। কেশ-সংস্কার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন কিন্তু সংসার ত্যাগ করিলেন না। ভাবিলেন প্রিয়তমার কি কোন কালে দর্শন পাইব না; এমন কথাই বা কে বলিতে পারে। যদি দর্শন ঘটে, তবে সরোজের চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব। আমার নয়ন জলে তাহার ধূলি-ধূষরিত আরক্তিম-চরণ-যুগল ধৌত করিয়া, এই প্রলম্বিত-কেশে মুছাইব। গৈরিক বসনে, প্রিয়ার নয়ন-জল মার্জ্জনা করিয়া দিব। সরোজবাসিনী নামালঙ্কৃতা জপমালায় পবিত্র এই করযুগল দ্বারা চরণ সেবা করিব। আরও প্রমাণ করিয়া দিব, প্রিয়া আমার সমস্ত সুখভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া, আমিও সে সকল পরিত্যাগ করিয়াছি। এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ

সকল দেখাইলেও কি পাতিব্রতা আমাকে ক্ষমা করিবে না? দয়া করিয়া কি আমার গৃহে পদার্পণ করিবে না? মানস-রাজহংসী কি আর আমার মানস-সরোবরে ক্রীড়া করিবে না? অবশ্যই দয়া করিবে, আমি এক-বার প্রিয়াকে গৃহে আনিতে পারিলে, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া তাহাকে সুখিনী করিব। ক্রমে কমলাকান্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। পরিবারগণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কমলা-কান্ত কোনরূপেই সম্মত হইলেন না। এক দিন কমলাকান্তের মাতা কহিলেন, কমল! বিবাহ না করিলে যে বংশ লোপ হইবে, এ ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করিবে বাবা! কমল কহিলেন, জননি! ভাগিনেয় আছে, সেই এ সমস্ত ভোগ করিবে। আর আমি বিবাহ করিয়া সরোজকে সপত্নী যন্ত্রণা দিব না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। অগত্যা সকলে ক্ষান্ত হইলেন।

সরোজবাসিনী ধ্যান, সরোজবাসিনী জ্ঞান, সরোজবাসিনী জপ এই করিতে করিতে কমলাকান্ত এক প্রকার পাগলের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিলেন। কমল, সরোজবাসিনীর শেষ পত্রখানি বাহির করিলেন এবং আপনি তাহার যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করি-লেন। যেখানে দশ জন লোক দেখেন সেইখানেই সেই পত্রদ্বয় পাঠ করিয়া কহেন, আমি দারত্যাগী মহাপাপী; এ নরাধমকে এই পাপের উপযুক্ত যে দণ্ড দেওয়া উচিত হয়, তাহা আপনারা আমাকে অসঙ্কু-চিত চিত্তে প্রদান করুন। হা জগদীশ! আমার মৃত্যু হইলে, আমি কেমন করিয়া আপনার অগ্রে দণ্ডায়মান হইব। হায়! হায়! আমি কর্ম্ম-দোষে উভয়কাল নষ্ট করিয়াছি। কমলাকান্ত, বিদ্বান্ এবং দয়ালু ছিলেন, ইহা পাঠক মহাশয়কে একবার জানাইয়াছি। লোকে সেই পরোপকারীর এই অভাবনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত, কিন্তু কোন কথাই তাঁহার হৃদয় মধ্যে স্থান পাইত না। কমলাকান্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বিজয়পুরে

উপস্থিত হইলেন। শ্বশুর এবং শ্বাশুড়ীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া সরোজবাসিনীর বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রিয়তমার প্রিয় বস্তু সকল যথা স্থানে পূর্ব্ববৎ পতিত রহিয়াছে ইহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া মনের বেগে হা প্রিয়ে সরোজবাসিনি! হা প্রিয়ে সরোজবাসিনি! বলিয়া পূর্ণস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আর কি সরোজ—গৃহে আছে যে তাঁহাকে উত্তর দিয়া শীতল করিবে। জামাতার অবস্থা দেখিয়া শ্বশ্রূ-দেবী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। গৃহ মধ্যে শোক-প্রবাহ বহিতে লাগিল। কমলাদেবী, আমার কন্যা বিনা কারণে এমন জামাতাকে কাঁদাইয়া গিয়াছে বলিয়া, উদ্দেশে সরোজকে কত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া কমলাকান্ত, বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, মাতঃ! সরোজের কোন অপরাধ নাই, আমিই তাহাকে বনবাসিনী সন্ন্যাসিনী করিয়াছি, এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পত্রগুলি পাঠ করিলেন। আর কহিলেন, তাহার গৃহত্যাগের অনেক বিবরণ, সরোজের পরিচারিণী অবগত আছে। আপনারা তাহার মুখেও শ্রবণ করিতে পারেন। তখন সকলে পরিচারিণীকে ডাকাইয়া সকল কথা শ্রবণ করিল। কমলাকান্তের প্রতি সকলের অশ্রদ্ধা হইল। কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা, তাহাদের সেই অশ্রদ্ধাকে অনেক পরিমাণে কমাইয়া দিল। কমলের অবস্থা দেখিয়া অনেকের মনে দারুণ দুঃখের উদয় হইল। ভৈরবদেব বহুযত্নে এবং বহুকষ্টে কমলকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইয়া সঙ্গে লইয়া রাজ ভবনে গমন করিলেন। যুবরাজ বিনয়, রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে ভৈরবদেব উপস্থিত হইলেন। যুবরাজ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সাদরে বসাইলেন। কমল, পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবরাজ জিজ্ঞাসা করি-লেন, আপনার পার্শ্বোপবিষ্ট ব্রহ্মচারিটি কে? ভৈরবদেব কহিলেন, ইনিই আমার জামাতা কমলাকান্ত: বিনয় চকিত হইয়া কহিলেন ইনিই আপনার জামাতা? আজ্ঞা হাঁ, ইত্যবসরে কমলাকান্ত উত্থিত

হইয়া, যুবরাজ! আপনার জয় হউক, আমি আপনার অধিকারবাসী-দারত্যাগী-বারকী-প্রজা কমলাকান্ত; আমি, সাংসারিক নানাবিধ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া মতিচ্ছন্ন প্রযুক্ত বিস্তর পাপরাশি সঞ্চয় করিয়া পাপক্ষয় মানসে রাজদর্শনে আসিয়াছি। যদি অনুমতি করেন, মনের কয়েকটি কথা রাজসভায় নিবেদন করিয়া কথঞ্চিৎ দুঃখ নিবারণ করি। যুবরাজ তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। কমলাকান্ত সভা-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া "প্রজাপালক পরম ধার্ম্মিক যুবরাজ! সভাস্থ সাধুসদাশয় শাস্ত্রার্থদর্শিন্ পূজ্যতম পণ্ডিত মহাশয়গণ! পরোপকারিন্ পরম ধার্ম্মিক স্বধর্ম্মপালক সভাস্থ সমস্ত জনগণ! একবার দয়া করিয়া, এ-দারত্যাগী পাপাত্মার কিঞ্চিৎ করুণ বিলাপ শ্রবণ করুন। আমার তুল্য নরাধম জগতে অতি বিরল। আমার স্ত্রী সরোজবাসিনী, সংসার ত্যাগ করিয়া যে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, এই পাপাত্মাই তাহার মূল কারণ। আপনাদিগের অন্তঃকরণে সরোজবাসিনীর বিষয়ে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু সরোজবাসিনী কলঙ্কিনী নহে। তাহার স্বভাব অতি নির্ম্মল; সেই সাবিত্রী সদৃশী পতিব্রতার গুণ বর্ণনে আমি অক্ষম, যে কারণে সরোজ, গৃহসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছে তাহা শ্রবণ করুন। এই বলিয়া সরোজের ও আপনার সমস্ত সংগৃহীত পত্রগুলি পাঠ করিলেন (এইখানে পাঠক মহাশয়, সেই পত্রগুলি পাঠ করিবেন) এবং নয়নের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই——

দারত্যাগী দুরাচার নরাধম শিরে
পড়ুক সহস্র বজ্র গভীর গর্জ্জনে।
শত খণ্ড ক'রে দেক্ এ-পাপ শরীরে,
এড়াই হৃদয় জ্বালা সুখের মরণে॥
কিম্বা আসি কালসর্প— প্রকাশিয়া ঘোর দর্প;
দংশুক্ আমার হৃদে শত শত বার।
বিষের জ্বালায় পাপ হ'ক ছারকার॥

এ-ছার জীবনে আর কি সুখের আশা।
সরোজের সঙ্গে সব গেছে রে চলিয়া।
হেলা করি হারায়েছি সেই ভাল বাসা,
হীরা ফেলি কাচ লয়ে গিয়াছি ঠকিয়া ॥
কি করিব কোথা যাব, কেমনে সরোজে পাব,
আর কি মানস-হংসী মানসে চরিবে।
হৃদয়ের ঘোর জ্বালা হরণ করিবে ॥
বৃথা সেই আশা আর, এ জনমে আর বার,
পাবনা পাবনা আমি সরোজ সতীরে।
এ-পাপ-অনল সদা দহিবে শরীরে ॥
উহুঃ উহুঃ ; বলিতে, হৃদয়-ফাটিয়া যায়।
রতি সতী, সত্যভামা—কেশবের মনোরমা,
হারি মানে যার গুণে— হায়! আমি কি কুক্ষণে,
(আচরণে অবিকল সাবিত্রীর সমা)
ধরিয়া লেখনী তারে ঠেলিয়াছি পায় ॥
ওহে সাধু সদাশয় মহাজন গণ!
ক'র না আমার আর মুখ বিলোকন ॥
দোহাই ধর্ম্মের কিরে, দাও দণ্ড নারকীরে ;
দণ্ড পেলে পাপ ভার হ'বে না কি ক্ষয়?
এ-ঘোর যাতনা প্রাণে আর নাহি সয় ॥
ওহে ঈশ! তব পদে, এ মিনতি পদে পদে
দারত্যাগী দুরাচার নরাধম শিরে,
পড়ুক সহস্র বজ্র গভীর গর্জ্জনে।
শত খণ্ড ক'রে দেক্ এ পাপ শরীরে,
এড়াই হৃদয় জ্বালা সুখের মরণে ॥

এই কথা বলিতে বলিতে হত চেতন হইয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। সকলে হায়! কি হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যুবরাজ নিকটে আসিয়া ব্যস্ততার সহিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণের পর কমলাকান্ত সংজ্ঞা লাভ করিয়া, হে চৈতন্য!

যদি গেলে অভাগার এ-দেহ ছাড়িয়া।
তবে ফিরে এলে বল কিসের লাগিয়া॥
বুঝেছি ভুগিতে পাপ হ'বে বহুকাল।
পরত্রেও পার্ নাই, দণ্ড দিবে কাল॥

উঃ কি যন্ত্রণা! সরোজ শূন্য এ সভাস্থলে আর থাকিবার আবশ্যক কি? এই বলিয়া গমনে উদ্যত হইলেন। যুবরাজ বিজয় বিস্তর বুঝাইলেন। কমলাকান্ত, বিস্তর স্তবস্তুতি করিয়া যুবরা
বিদায় লইয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সার-বস্তু কি?

ধর্ম্ম অতি সার বস্তু; ইহার স্নিগ্ধজ্যোতিঃ, চন্দ্রপ্রভা অপেক্ষাও মনোহারিণী: চন্দ্রে, প্রভার হ্রাসবৃদ্ধি এবং রাহুর ভয় আছে। ইহাতেও তাহা লক্ষিত হয়। পাপরাহু, ইহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া আছে। পাপ-গৃহিনী দুষ্প্রবৃত্তি সকল ধর্ম্মক্ষয় বাসনায় সর্ব্বদা চিন্তাকুলা। ধর্ম্মক্ষয় হইলেই সব নষ্ট হয়। মনুষ্যের ধর্ম্মনষ্ট হইলে আর কি থাকিল? যদি ধার্ম্মিক হইয়া পৃথিবীর

পূজ্য এবং পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র হইতে চাও, তবে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া এই মহান্ বৃক্ষের অমৃতময়-ফলভোগে বঞ্চিত হইও না। ইহার সুশীতল ছায়ায় তাপিত অঙ্গ শীতল করিতে ক্ষণকালের জন্যেও অমনোযোগী হইও না। সত্য, ধর্ম্মের মূল ভিত্তি; যেখানে সত্য নাই সেখানে ধর্ম্মও নাই। বিষয় লোভে মত্ত হইয়া সত্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিও না। অকারণেই হউক আর কারণ সত্ত্বেই হউক কাহারও সর্ব্বনাশ করিয়া স্বার্থসাধন করিও না। পার্থিব বিভব, বিভব নয়, যে বিভব তোমাকে উভয় কালে রক্ষা করিবে, তাহাকে আয়ত্ব করিতে সতত সতর্ক থাকিবে। সংসারের ঘোর যন্ত্রণায় অকথ্যরূপে নিষ্পিষ্ট হইলেও, সমস্ত ঐশ্বর্য্য হারাইলেও, উদরান্ন জন্য লালায়িত হইলেও, বাসগৃহ অভাবে তরু-মূলসার হইলেও, সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। সত্যে বিনাশ নাই। ধর্ম্মে ভয় নাই। যিনি ইহাদের শরণাগত হয়েন, তিনি উভয়কালে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাঁহার ধর্ম্ম পিতা, ক্ষমা মাতা, শান্তি গেহিনী, সত্য পুত্র, সত্যপ্রিয়তা পুত্রবধূ; অটল অধ্যবসায় ভ্রাতা; তাঁহার তুল্য সুখী এজগতে আর কে আছে? যিনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ তিনিই নির্ভীক; তাঁহার প্রশস্ত সত্য পথে শত্রুর সংস্রব নাই। সৎকার্য্য তাঁহার নিত্যব্রত, যিনি সর্ব্বদা সৎ-কার্য্য করিয়া সত্যপথে ভ্রমণ করেন, তিনি সকলের আদর্শ স্বরূপ; তাঁহার গুণরূপ অলঙ্কারে পৃথিবী অলঙ্কৃতা। সতীর ধর্ম্ম প্রতিপালিকা সৎপথাবলম্বিনী সরোজবাসিনীই ইহার উপমা স্থল; ঐ দেখুন মাধুর্য্য-ময়ী সরোজবাসিনী কেমন প্রশান্ত মনে ধর্ম্মের উপাসনা করিতেছেন। কাশী—স্বর্ণমন্দির মধ্যে বিশ্বেশ্বর বিরাজিত, সম্মুখে স্বর্ণ-প্রতিমা ষোড়শী রমণী আসীনা হইয়া, চন্দনমিশ্র-বিল্বদল দিয়া, কেমন ভক্তিভাবে মহেশ্বরের আরাধনা করিতেছেন। রূপশোভায় মন্দির প্রতিফলিত; অন্যান্য সকলে চকিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। আর ভাবি-তেছেন, ইনি কি পাষাণনন্দিনী উমা! মনঃপ্রাণ বিনিবিষ্ট করিয়া

নিজ পতির আরাধনায় নিযুক্ত আছেন ; অন্যথা মনুষ্যলোকে এ-ঘটনা সম্ভবে না ; কি আশ্চর্য্য ! বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণকে ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা দিবার নিমিত্তই কি ইনি সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন ! মরি ! মরি ! কোন্ হতভাগ্যের গৃহলক্ষ্মী হতভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন। যাহাকে ইনি বিমুখী ; তাহার তুল্য দুর্ভাগ্য জগতে অতি বিরল ; সরোজবাসিনী, শিব-শিবার পূজা সমাপন করিয়া উদ্দেশে নিজ পতির পূজা করিলেন। তদনন্তর জানু পাতিয়া আসীনা হইয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে মহেশ্বরের স্তব আরম্ভ করিলেন।

কিবা পদ্মাসনাসীন, পঞ্চমুখ ত্রিনয়ন,
শশধর শোভা করে ভালে।
কিবা খড়্গ পরশু শূল, অশনির নাহি তুল,
শোভয়ে দক্ষিণে ভূষণ জালে॥
কিবা ঘণ্টা নাগপাশ, ডমরুক অঙ্কুশ,
শোভা করে দক্ষিণ ইতর অঙ্গে।
কিবা যোগী-জন-মনোলোভা, স্ফটিকমণি শোভা,
নমি আমি যোগীবর ভবভয় ভঙ্গে॥
বন্দি দেব উমাপতি, সুরগুরু জগৎপতি,
জগত কারণ তুমি, তুমি ভবধব হে।
ভুজঙ্গমে শোভা কর, পশুপতি মৃগধর,
সূর্য্য অগ্নি চন্দ্রনেত্র মুরারি বান্ধব হে॥
বরদ শিবদ ত্রাতা, ভকতের তুমি পাতা,
তবপদে নমে দাসী শঙ্কর ! শঙ্কর হে।
কঠোর জঠর বাস, বাল্যকালে স্তন্যে আশ,
মলযুক্ত ভূপতিত সদা কলেবর হে॥

তদন্তে যৌবনাগতে, সুখ ইচ্ছা নানামতে,
তব নাম একবারে বিস্মরণ. হই হে।
পরে এলে বৃদ্ধদশা, রোগশোকে করে বাসা,
নষ্ট হয় সব আশা মনোদুঃখে রই হে॥
প্রাতঃকালে স্নান করি, গাঙ্গতোয়ে কুম্ভ ভরি,
চিনি মধু আজ্যে তব লিঙ্গ ধৌত করি হে।
স্বর্ণপদ্ম বিল্বদলে, নাহি পূজি কুতূহলে,
ব্রহ্মবাচ্য তবলিঙ্গ সূর্য্য-পুত্র-অরি হে॥
ভাসি আমি আঁখি নীরে, দয়াকর দুখিনীরে,
ক্ষম মম অপরাধ পার্ব্বতীবল্লভ হে।
এই ভিক্ষা পশুপতি, তব পদে থাকে মতি,
ওপদ পরম বস্তু যোগীর দুর্লভ হে॥

(ভজন।) "হর শঙ্কর শশিশেখর পিনাকী ত্রিপুরারে।
বিভূতি ভূষণ দিকবসন জাহ্নবীজটাভারে॥
অনল ভালে মদন দমন, তরুণ-অরুণ-কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজতবরণ, মণ্ডিত ফণীহারে।
উক্ষারূঢ় গরল ভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষঃ,
ভিক্ষা লক্ষ্য, পিশাচ পক্ষ রক্ষ ভব পারে॥"

"আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতিক্ষয়ং যৌবনং,
প্রত্যাযান্তিগতাঃ পুনর্দিবসাঃ কালোজগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা, বিদ্যুচ্চলং জীবনং,
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ! ত্বংরক্ষ রক্ষাধুনা॥
করচরণং কৃতংবা কায়জং কর্ম্মজংবা,
শ্রবণনয়নজংবা মানসং বাপরাধং।

বিদিত মবিদিতংবা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব,
জয় জয় করুণাব্দে শ্রীমহাদেব শম্ভো ! ॥
গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং,
খটাঙ্গঞ্চসিতং সিতশ্চবৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতং জটাপয়সি, তচ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি,
সোহয়ং সর্ব্বসিতোদদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥”

সরোজবাসিনী শিবপূজা সমাপন করিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন এবং কিছু দিন কাশীতে অবস্থান করিয়া পরে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া রাধাশ্যাম দর্শন-পূজন পূর্ব্বক স্তব সমাপ্ত করিলেন। তদনন্তর নানাদেশ ও নানা স্থান পরিভ্রমণের পর বিন্ধ্যাচলে আরোহণ করিয়া, তথায় প্রতিষ্ঠিত এক কালী মুর্ত্তির পূজায় বসিলেন। বহুক্ষণের পর পূজা শেষ হইলে, গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগিলেন, জননি জগত্তারিণি ! এ-সুদীনা দুহিতাকে অন্তে শ্রীপাদপদ্মে স্থানার্পণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। আপনার মহিমা বেদের অগোচর; সমস্ত দেবগণ আপনার শক্তিতেই শক্তিসম্পন্ন; আপনি মূল-প্রকৃতি, আপনা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। অন্তে এই চরণ-কমলেই লয়প্রাপ্ত হইবে। আপনি প্রকৃতি কি পুরুষ; স্থুল কি সূক্ষ্ম, আদি কি অনাদি, তাহা নিশ্চয় করা আমার সামান্য জ্ঞানের কর্ম্ম নয়। মুনি, ঋষি যোগীগণ যে চরণে লীন হইবার নিমিত্ত, শত সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যে চরণে আশ্রয় অভিলাষে বিষ্ণু সতত লালায়িত এবং ব্রহ্মা নিয়ত ধ্যান পরায়ণ, যে চরণ, হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরমযোগী পশুপতি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া সেই চরণের গুণ-গরিমা বর্ণন করিব। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বলিত কত অনন্ত বিশ্ব, এই চরণ-প্রান্তে নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। কত শত ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর,

নিয়ত এই চরণের উপাসনায় নিযুক্ত আছেন। মাতঃ শিবে! সর্ব্ব-মঙ্গলে! আপনি ব্রহ্মময়, আপনিই ব্রহ্মময়ী; লোকে আপনার নিরাকার ব্রহ্মমূর্ত্তি অবধারণে অসমর্থ হইয়াই, মূর্ত্ত্যন্তর কল্পনা করিয়া থাকে। আপনি ভক্তের নিকটে নিরাকারা হইয়াও সাকারা, অদর্শনীয়া হইলেও দর্শনীয়া হইয়াছেন। যাহারা আপনাকে আকার বিশিষ্ট করিয়া সীমাবিশিষ্ট মনে করে, তাহারা নারকী, যাহারা আপনাকে জড়নির্ম্মিত পুত্তলি মনে করিয়া চক্ষুর্দান জীবদান প্রভৃতি দিয়া পূজা করে, তাহারা নির্জীব জড়পদার্থ মধ্যে পরিগণিত; আপনি জীবের জীবন, অন্ধের চক্ষু, জ্ঞানীর জ্ঞান এবং দুর্ব্বলের বল; ভক্তগণ উপাসনার জন্য, আপনার মূর্ত্তি পরম্পরা কল্পনা করিয়া জীবের মুক্তির পথ আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি সামান্য জ্ঞানে পৌত্তলিকতায় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সে ঘোর-মূর্খ; যদি উপাসনার কোন সুচারু পদ্ধতি থাকে, তবে তাহা পৌত্তলিকতা; ইহাতে সাংসারিক আনন্দ এবং পারত্রিক চাতুর্ব্বর্গ ফল উভয়ই আছে। ইহাতে মূর্খ হইতে জ্ঞানী পর্য্যন্ত সকলেই সমভাবে ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া থাকেন। জননি! আমি জ্ঞানহীনা অবলা, আপনার মহিমা পরিজ্ঞানে নিতান্ত অশক্ত, এক্ষণে কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করুন। এই বলিয়া প্রণাম করিয়া তথা হইতে যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রভুত্ব।

সুরেন্দ্র নানাদেশ ও নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়াও শরচ্চন্দ্রের কোন অনুসন্ধান করিতে পারিল না। এক দিন এক প্রকাণ্ড প্রান্তর

অতিক্রম করিয়া আসিতে আসিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রান্তর প্রান্তস্থ বন-বিভাগে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল। পিপাসায় বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে; ক্ষুধায় দশদিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে তথায় এক বনবাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্র তাহাকে আপনার অবস্থার বিষয় যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া পানার্থ কিঞ্চিৎ জল ভিক্ষা করিলেন। বনবাসী তাহাকে সঙ্গে লইয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিল এবং এক পল্বল দেখাইয়া দিল। সুরেন্দ্র জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। পরে বিশেষ আগ্রহের সহিত ধর্ম্ম-সাক্ষী রাখিয়া উভয়ে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। বনবাসীর নাম মহেশ্বর; মহেশ্বর নব মিত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। সুরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে বিস্তর মনুষ্য বন মধ্যে একত্র বাস করিতেছে। তাহারা সকলেই মহেশ্বরকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করে এবং সকলে সরল অন্তঃকরণে সম্মান ও ভক্তি করে। ক্রমে যতই, দিন গত হইতে লাগিল, সুরেন্দ্র মহেশ্বরের গুণে ততই প্রীতি লাভ করিতে লাগিল। দেখিল মহেশ্বর বনবাসী অসভ্য মনুষ্য নহে, তাহার স্বভাব অতি পবিত্র, কার্য্য অতি সুন্দর এবং ব্যবহার অতি রমণীয়; কিসে আশ্রিত এবং অনুগত ব্যক্তি সকল সুখসচ্ছন্দে থাকিয়া কালাতিপাত করিবে, কিসে তাহাদের অভাব দূরীভূত হইবে, সর্ব্বদা তজ্জন্য মহাব্যস্ত; প্রাণান্তেও কাহাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করে না। কারণ সত্ত্বেও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুত্ব প্রদর্শনে নিতান্ত বিমুখ, মিষ্টবাক্যে দোষীর দোষ ব্যাখ্যা করিয়া, দোষীকে সৎপথে আনয়ন করিয়া থাকে, যাহাকে দণ্ড দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়, অতি দুঃখিতান্তঃকরণেই তাহাকে তাহা প্রদত্ত হয়। সৎকার্য্যের পুরস্কার নিয়তই হইয়া থাকে। উপযুক্ত ব্যক্তির উন্নতি সাধনে দৃঢ়ব্রত; ভৃত্য-সকলকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করা মহেশ্বরের প্রধান ধর্ম্ম; শিষ্য সকলকে সন্তান অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসে। অনুগত জনের জন্য প্রাণ-দানেও বিমুখ নহে। বনবাসীগণও

মহেশ্বরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী, তাহারা ইহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। অধিক কি আবশ্যক হইলে প্রাণ-দানেও কিছুমাত্র কাতর নহে। আমি অনুরোধ করি, সামাজিক উচ্ছৃঙ্খল প্রভু মহাশয়েরা, মহেশ্বরের গুণের অনুকরণ করেন। অনেক অবিমৃষ্যকারী উদ্ধত প্রভু, অধীনস্থ ভৃত্যগণের উপর অনর্থক এত অসঙ্গত প্রভুত্ব প্রদর্শন করে যে, তাহা মনে করিলে ঘৃণার উদয় হয়। অনেক অনভিজ্ঞাত প্রভু ; উচ্চপদে আরোহণ করিয়া মনে করে,আমা অপেক্ষা ঈশ্বর অধিক শ্রেষ্ঠ নহেন। আমার অধীনস্থ ব্যক্তি সকল, মনুষ্য মধ্যে গণ্য নহে। ইহাদিগের মানসম্ভ্রম বংশমর্য্যাদা থাকায় নাথাকায় সমান। ইহারা চিরকাল আমার পদ-লেহন করিবে। আমি যাহা আজ্ঞা করিব, সঙ্গত বা অসঙ্গতই হউক তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে। কথায় কথায় আমার তিরস্কার সহ্য করিবে। মদীয় কটু বাক্যকে পুষ্পহার জ্ঞান করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবে। আমার কৃত তাড়নাকে সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া হৃদয়ে স্থানার্পণ করিবে। মৎকৃত বানরের ন্যায় সক্রোধ মুখ ভঙ্গিকে অমৃত সমুদ্রের প্রেম-তরঙ্গ মনে করিবে। ইহাদের উন্নতি হউক আর না হউক আমার উন্নতিকে উন্নতি মনে করিবে। আপনারা উদর জ্বালায় জ্বালাতন হইলেও আমার জন্য সুরস সুখাদ্য আহরণ করিবে। অর্থাভাবে, ইহাদের স্ত্রীপুত্র ভিক্ষা করিলেও আমার অর্থ বৃদ্ধি পক্ষে কন্টক হইতে পারিবে না। ইহাদের দ্বারা যে উন্নতি হইবে, সে উন্নতি জন্য ফল ভোগ আমার হইবে। ইহারা আমার আহারের অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ কাঁটা খোঁচা ভক্ষণ করিয়া বিড়ালের ন্যায় মেউঁ মেউঁ করত প্রতিগ্রাসে মুখ পানে চাহিয়া থাকিবে। ইহারা আমাকে দর্শন করিয়া শমন দর্শনের ফল লাভ করিবে। ইহারা, পদে পদে অপমান সহ্য করিয়া নিজ নিজ পদ রক্ষা করিবে।

দুরাচার উচ্চপদে আরোহণ করিয়া এইরূপ দুর্ব্যবহারে অধীনস্থ মহাত্মাগণের হৃদয়ে অকারণে যন্ত্রণানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া আপনার

হীন বংশের পরিচয় দেয় এবং আপনার নীচ প্রকৃতি প্রকাশ করে। একবার ভ্রম ক্রমেও চিন্তা করে না যে আমাপেক্ষাও কত শতগুণে উৎকৃষ্ট কত কত মহাত্মা আমার অধীনে আছেন। আজি আমি উচ্চ-পদে আরোহণ করিয়াছি, কালি আমার অধঃপতন হইতে পারে। অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিলে সর্ব্বশাস্তা জগৎপতি, আমাকে গুরুতর দণ্ড প্রদান করিতে পারেন। দর্পহারী আমার দর্প চূর্ণ করিয়া এই পদে অন্য ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। নীরস হইবার ভয়ে যে রসনাকে তিনি সর্ব্বদা রসশালিনী করিয়াছেন আমি তাহাকে কালসর্পী-সদৃশী করিয়া অকারণে কেন তদ্দারা হলাহল বহির্গত করি। এক দিন আমায় এ-সকল পরিত্যাগ করিয়া শমন-সদনে গমন করিতে হইবে। সময় থাকিতে, প্রভুশক্তি থাকিতে, অধীনের উন্নতি করাই কর্ত্তব্য; অধীনের উন্নতি হইলে তদ্দারা তাহার বহু-পরিবারের উন্নতি হইবে। তাহারা আশীর্ব্বাদ করিলে পরমপিতা আমায় দয়া করিবেন। যে মহাপুরুষ এইরূপ মনে করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তাঁহার সহিত কোন প্রভুর তুলনা হয় না। তিনিই পরম পিতার সাক্ষাৎ প্রিয় পুত্র; তিনি প্রাতঃ স্মরণীয়, তাঁহার পবিত্র নাম, আমাদিগকে পবিত্র করে। তাঁহার চরণ-ধূলি আমাদিগের প্রিয় বস্তু; হে স্বার্থপর প্রভু মহাশয়গণ! অন্যায় ব্যবহারের বিনি-ময়ে দুর্ম্মোচ্য মহা নরক সঞ্চয় না করিয়া একবার বনবাসী মহেশ্বরের উদার চরিত্র শিক্ষা করিয়া পবিত্র হইতে যত্নবান হও। আর পর-লোক-গমন-পথে কণ্টক রোপণ করিও না। আর ইচ্ছা করিয়া দক্ষিণ হস্তে হলাহল ভক্ষণ করিও না। আর অন্যায় ব্যবহারে স্বর্গস্থ-পিতৃ পুরুষগণকে স্বর্গ ভ্রষ্ট করিও না। তোমাদিগকে ঈশ্বরের দোহাই, দুর্ব্ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র হও।

মহেশ্বর সুরেন্দ্রকে গৃহে আনিয়া, তাহার পান-ভোজন-শয়নাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিল। তথায় থাকিয়া সুরেন্দ্র সকল কষ্ট বিস্মৃত

হইয়া গেল। পবিত্র বনবাসীগণের পবিত্র ব্যবহারে সুরেন্দ্রের অন্তঃকরণ পবিত্র হইল। ক্রমে সৎপথের পথিক হইতে বাসনা জন্মিল। এক দিন সুরেন্দ্র ইন্দুমতীর সকল ঘটনা, মিত্রকে অবগত করাইয়া ইন্দুমতীর বাক্য এবং নিজের প্রতিজ্ঞা, বন্ধুকে জানাইল। মহেশ্বর, সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, বন্ধো! অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, হিংসা হইতে যত অন্তরে থাকা যায় ততই মঙ্গল; কিন্তু সতীর বাক্য এবং তোমার প্রতিজ্ঞা;—তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে পারে কিন্তু সতীবাক্য মিথ্যা হইবার নহে। এ বিষয়ে আমার মতামতের অপেক্ষা নাই। তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করিও। ওহে বনবাসিন্‌গণ! তোমরা সকলে সুরেন্দ্রকে আমার পরম মিত্র বলিয়া জানিও। এই বলিয়া অন্যান্য কথা বার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইয়া বন্ধুর চিত্ত-বিনোদন করিতে লাগিল। এইরূপে অনেক দিন গত হইয়া গেল।

এক দিন সুরেন্দ্র কতিপয় বনবাসীর সহিত বন-ভ্রমণ করিতে করিতে বনপ্রান্তে আসিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল। তথা হইতে কিছু দূরে প্রান্তর মধ্যস্থ রাজপথ দিয়া কয়েকটি উদাসীন যাইতেছে দেখিতে পাইল। সুরেন্দ্র তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে সহসা উত্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আমার অন্বেষ্টব্য বস্তু আজি আমি প্রাপ্ত হইলাম। এই কথা বলিতে বলিতে বেগে তদ্দিকে প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল মধ্যেই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ঘোরতর-কঠোর-নিনাদে কহিল, নরপিশাচ সতীত্বনাশক রাক্ষস শরৎ! বহুদিনের পর আজি তোর্ দর্শন পাইলাম। ঈশ্বর আজি সতীবাক্য সফল করিবার উপযুক্ত সময় দিলেন। আয়—তোকে বিনাশ করিয়া তোর্ বক্ষস্থ রক্ত পান পূর্ব্বক স্বর্গস্থা ইন্দুমতীকে পরিতুষ্ট করি। এই বলিয়া দন্ত কড়মড় করিতে করিতে বাহু-স্ফোটন করিয়া ঊর্দ্ধে লম্ফ ত্যাগ করিতে লাগিল। ক্রোধবশে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কেশাবলি ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে লাগিল। শরৎ সাক্ষাৎ শমনসদৃশ সুরেন্দ্রকে

অবলোকন করিয়া ভাবিল, এত দিনে আমার মহা-পাপ-বৃক্ষ বুঝি ফলবান্ হইল। সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসী সকল, এই ব্যাপার দর্শনে প্রাণ লইয়া যথেচ্ছ পলায়ন করিল। শরৎ এবং সুরেন্দ্রে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। শরৎ কহিল, আয় নরাধম আয়;—আজি বিশ্বাস-ঘাতক পর-পত্নী-গামী কপট বন্ধুকে বিনাশ করিয়া চির-সঞ্চিত-ক্রোধা-নলে শোণিতাহুতি প্রদান করি। সুরেন্ কহিল, জায়াজীব বেশ্যাপতি শরৎ! তোর্ স্ত্রী চির বেশ্যা, আমি সতীত্ব নাশক নহি এবং আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাতে উপগত হই নাই। সেই পাপীয়সীই বলপূর্ব্বক আমাতে উপগত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মই জানেন। আয় এক্ষণে নিজ নিজ বল বিক্রম দেখাইয়া, নিজ নিজ পাপের গুরুত্ব লঘুত্ব প্রদর্শন করি; যে মহাপাপী, সে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। উভয়ে ঘোর সমর বাধিয়া গেল। বনবাসী সঙ্গি সকল বসিয়া দর্শন করিতে লাগিল। শরৎ, সুরেন্দ্র অপেক্ষা বলশালী; বিশেষ মল্লযুদ্ধে বিশেষ দক্ষ; মনে করিল, সুরেন্দ্রকে অনায়াসেই বিনাশ করিব। কিন্তু কার্য্যকালে সেরূপ হইল না। উভয়কে উভয়েই আঘাত করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রের প্রত্যেক আঘাতেই শরৎ বিশেষ ব্যথা পাইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ তাহার বলের হ্রাস হইয়া আসিল। তখন শরৎ মনে করিল—আজি অবশ্যই আমাকে দেহত্যাগ করিতে হইবে, আর রক্ষা নাই। তথাচ জীবিতাশা পরিত্যাগ করা যায় না। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিশেষ সতর্ক হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বাহুতে বাহুতে, পদে পদে, বক্ষে বক্ষে, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে, মস্তকে মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। কীল, লাথি, চড়ের ভয়ানক শব্দ উঠিতে লাগিল। পরে জড়াজড়ী করিয়া উভয়ে ধরণী পৃষ্ঠে পতিত হইল। পর্য্যায় ক্রমে উভয়ে, উভয়ের উপরে উঠিতে লাগিল। বলে কেহ ঊন নহে। উভয়ের সমর প্রভাবে তৎস্থান কম্পিত হইতে লাগিল। যোদ্ধৃদ্বয়ের গুম্ গুম্ হুম্ হুম্ দুপ্ দাপ্ শব্দে মেদিনী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্রমে শরৎ অবসন্ন হইয়া

পড়িল। সুরেন্দ্র তাহাকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া তাহার বক্ষের উপর উঠিয়া বসিল এবং বাম হস্তে শরতের কণ্ঠপ্রদেশ চাপিয়া ধরিল। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কটিমধ্য হইতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া দন্ত-সহায়ে ফলক বহির্গত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ইন্দু! দিদি ইন্দু! স্বর্গবাসিনি সতি পতিব্রতে ইন্দু! আসিয়া দর্শন কর, তোমার বাক্য সফল হইল, এই বলিয়া শরতের বক্ষদেশে চাক্‌চিক্যময়ী ছুরিকা আমূল প্রবেশ করাইয়া তৎস্থান বিদীর্ণ করিল। বক্ষ হইতে শোণিত প্রবাহ বহিতে লাগিল। সুরেন্দ্র ক্ষত স্থানে মুখার্পণ করিয়া শরতের উষ্ণ শোণিত পান করিতে লাগিল। রক্ত প্রবাহে স্কন্ধদ্বয় এবং বক্ষ ভাসিয়া গেল। সুরেন্দ্র রুধির পানে মত্ত হইয়া ছুরিকা হস্তে উত্থিত হইল। শরৎ—উঃ—উঃ!—মরি!—মরি!—হা!—পর—মে—শ্বর—আর—না—দ—য়া—ক—র,—উঃ—প্রা—ণ—যা—অ—স্তে—শ্রী—পা—দ—প—দ্মে—স্থা—ন—দি—ও—ও—উঁ—উঁ—উঁ—— করিয়া জীবন হারাইল। বনচরেরা সুরেন্দ্রকে প্রকৃতিস্থ করিল। সুরেন্দ্র, শরতের শোণিত দ্বারা শরতের বস্ত্রে “সতীত্ব নাশক শরৎ আজি জীবন দানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল” এই কয়েকটি অক্ষর লিখিয়া পতাকাকারে স্থাপন করিয়া মিত্র গৃহে গমন করিল।

সময়ের কি বিচিত্র গতি! দৈবের কি ভয়ানক প্রভাব! এইকালে মৃতঃচলাপহারকের মনোযোজিনী শরতের স্ত্রী শৈলবালা, উপপতির সহিত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল। আসিবার কালে পথপ্রান্তে পতিত মৃত শরচ্চন্দ্রকে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিল, পরে হায়! আমার কি হইয়াছে বলিয়া শরতের উপর পতিত হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিল। তৎপরে উত্থিত হইয়া উড্ডীয়মান পতাকাক্ষর পাঠে জানিতে পারিল, সুরেন্দ্রই এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। শৈলবালা উপপতির সাহায্যে শরতের মৃতদেহ পার্শ্ববর্ত্তী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বন-বিভাগ।

ধারা রাজ্য হইতে দূত আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে কুমার হংসকেতু, বিজয়পুরে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে পিতৃ-আজ্ঞানুসারে প্রিয়তমা রত্নমালাকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নগেন বাবু শ্যামা নাম্নী পরিচারিকাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত; সুতরাং শ্যামাও সঙ্গে চলিল। কিছু দিন পরে তাঁহারা ধারা রাজ্যের সীমা-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের রাজপথ অতীব বিপদ সঙ্কুল, যেহেতু বন-মধ্যস্থ; এই বন, ধারা রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব সীমা-প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যে কত দূর চলিয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইহা শাল-তাল-তমাল প্রভৃতি বিবিধ বনপাদপে সমাচ্ছন্ন; বনস্থ পর্ব্বত প্রমাণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া যেন গগনের পরিমাণ মানসেই ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। পাদপাবলি শাখায় শাখায় সম্বন্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণ প্রতিরোধ করায় নিম্ন ভাগ ঘোর অন্ধকারে আবৃত; মধ্যে মধ্যে বৃক্ষাশ্রিতা লতাবল্লী সেই অন্ধকারকে আরও প্রগাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও বংশ বন, কন্টকাকীর্ণ তরঙ্গিত স্থান, গণ্ডশৈল, সরিৎ, জলাভূমি, হ্রদ, দৃষ্টি গোচর হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ; হিংস্র জন্তুর শ্রুতিকঠোর ভয়ানক শব্দ, ঝিল্লির ঝিঁ ঝিঁ শব্দ, বনবেণুর কোমল শব্দ, বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর শব্দ, তরঙ্গিণীর কল্‌কল্ শব্দ বিবিধ শব্দে সমস্ত অরণ্য শব্দায়মান; এই নিবিড় বনে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর

বহির্গমনের উপায় নাই। এই বিশাল বন মধ্যে অসংখ্য দুর্দান্ত লোক বাস করিয়া থাকে। লুণ্ঠন ইহাদিগের ব্যবসায়; ইহারা অকার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদিগের রাজার নাম চন্দ্রচূড়; চণ্ডেশ্বর নামে রাজার এক সেনাপতি আছে। এই ব্যক্তি সমর-কার্য্যে বিশেষ দক্ষ, কিন্তু অতিশয় নিষ্ঠুর; ইহার অধীনে বহুসংখ্যক বন্য-সৈন্য আছে। চণ্ডেশ্বর তাহাদিগকে সর্ব্বদা সভ্য জনপদ লুণ্ঠনে নিযুক্ত করে। পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ ইহাদিগের জ্বালায় নিয়ত জ্বালাতন হইয়া থাকে। এক সময় ইহারা ধারা রাজ্যাধিপতি রুদ্রদেবের রাজ্য আক্রমণ করে। রাজা এই সংবাদে ইহাদের দমনের জন্য কুমার হংসকেতুকে পাঠাইয়া দেন। যুবরাজ আসিয়া বিস্তর বন্যকে রুদ্ধ করেন এবং বিশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া ইহাদের কয়েক জনকে নিপাতিত করেন। অবশিষ্ট সকলকে দণ্ড দিয়া ছাড়িয়া দেন। বন্যগণ, এই কারণে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া সতত রাজার ছিদ্রানুসন্ধান করিতে থাকে। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। এক্ষণে অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া অসংখ্য লোক আসিয়া যুবরাজকে আক্রমণ করিল। ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বহুসংখ্যক বনচর ধরাশায়ী হইল। তথাচ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিল না। ক্রমে যুবরাজের সৈন্য সংখ্যা অল্প হইয়া আসিল এবং অধিকাংশ ব্যক্তি শমন সদনে গমন করিল। বন্যগণ, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল। তদনন্তর হংসকেতু এবং রত্নমালাকে গ্রহণ করিয়া চন্দ্রচূড়ের নিকটে আনিয়া দিল। গতিক মন্দ দেখিয়া পূর্ব্বেই শ্যামা নগেন্দ্রকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায়, কতকগুলি বনচরের সম্মুখে পতিত হয়। তাহারা বসন ভূষণে অলঙ্কৃত নগেন্দ্রকে শ্যামার সহিত গ্রহণ করিয়া বন প্রবেশ করে। পরে তাহাদের বস্ত্রালঙ্কার কাড়িয়া লইয়া, এক জন মনুষ্য-ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করে। সে ব্যক্তি আবার তাহাদিগকে লইয়া স্থানান্তরে বিক্রয় করে এইরূপে তাহারা, যে রাজ্যে আসিয়া পড়িল, সে রাজ্যে রমাপতি নামে এক কিরাত রাজা,

রাজত্ব করেন। তিনি অপুত্রক; লোকমুখে নগেন্দ্রের সংবাদ পাইয়া, তাহাকে শ্যামার সহিত ক্রয় করত নিজ পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শ্যামা তথায় নগেন্দ্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিল।

এদিকে চন্দ্রচূড়, হংসকেতুকে যন্ত্রণাময় কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া, রত্নমালাকে আপনার ভোগ্যা করিবার অভিলাষ করিল। রত্নমালা অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্না কামিনী, ধর্ম্মজ্ঞান হীন চন্দ্রচূড়ের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাকে দেখিলে সংযমীর মনও বিচলিত হয়। এক দিন চন্দ্রচূড়, রত্নমালার নিকট আগমন করিয়া কহিল, সুন্দরি? বাদ্যধ্বনির গোলমাল কি শুনিতে পাইয়াছ? এবং তাহার কারণ কি, কিছু কি অবগত হইয়াছ? যদি না অবগত হইয়া থাক, তবে শ্রবণ কর। আজি দুরাত্মা হংসকেতুকে প্রজাগণের অনুরোধে বলিদান দিলাম। তুমি আর তাহার আশা করিও না। এক্ষণে আমার সহধর্ম্মিণী হইয়া পরম সুখে রাজ্য-সুখ-সম্ভোগ কর। শ্রবণমাত্র রত্নমালা হা স্বামিন্! বলিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন। চন্দ্রচূড় অনুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। রত্নমালা বিনাইয়া বিলাপ আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রচূড় সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। চন্দ্রচূড়ের নগবালা নাম্নী এক স্ত্রী আছে। সে রত্নমালাকে দর্শন করিয়া অবধি মনে মনে নানাবিধ আশঙ্কা করিতেছিল। এক্ষণে অন্তরাল হইতে চন্দ্রচূড়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিল, এ রাজরাণী হইলেই আমার কপাল পুড়িয়া যাইবে। রাজা আর আমার গৃহে আগমন করিবেন না। অধিক কি, হয় ত আমাকে ইহার দাসী হইতে হইবে। এক্ষণে ইহার প্রতিকার না করিলে আর চলে না। পরে রাজা প্রস্থান করিলে, নগবালা প্রিয় দাসী গোলাপীকে আহ্বান পূর্ব্বক গোপনে গোপনে পরামর্শ করিয়া উপায়াবধারণ করিল।

একদা ঘোরা অন্ধকারময়ী রজনীতে নগবালা, রত্নমালার গৃহে আগমন করিয়া কহিল, ভগিনি! তোমার পতি জীবিত আছেন। আমি

তোমাকে আমার দুরাচার স্বামীর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। অতঃপর এখানে থাকিলে তোমার সতীত্ব থাকিবে না। তুমি এখান হইতে যথেচ্ছ প্রস্থান কর। স্বদেশে উপস্থিত হইয়া স্বামীর উদ্ধার করিতে পার করিও, অদ্য হইতে বৎসর পরিমিত কাল আমি তোমার স্বামীকে জীবিত রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। ইহা বলিয়া রত্নমালাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া, গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিয়া কহিল, এই পথে যথেচ্ছ গমন কর। রত্নমালা, সজল নয়নে কহিলেন, ভগিনি! আমার স্বামীই যদি জীবিত না থাকেন তবে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? নগবালা কহিলেন, সতীত্ব নারীর পরম ধন, অগ্রে তাহা রক্ষা কর, পশ্চাৎ স্বামী পাইলেও পাইতে পার। রত্নমালা কহিলেন, ভগিনি! আমার দিব্য সত্য করিয়া বল, আমার স্বামী জীবিত আছেন কি পরলোকে গমন করিয়াছেন? নগবালা কহিলেন, ভগিনি! ঈশ্বরের দিব্য আমি তোমাকে প্রতারিত করিতেছি না, তোমার স্বামী জীবিত আছেন। আসিয়া উদ্ধার করিও। রত্নমালা কাঁদিতে কাঁদিতে নগবালাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ভগিনি! যদি ঈশ্বর দিন দেন তবে আমি তোমার কৃত এই উপকারের প্রতিশোধ করিব। এই বলিয়া নগবালার প্রদর্শিত পথে যামিনী সহায়ে প্রস্থান করিলেন। যদি রত্নমালা, নগবালার প্রদর্শিত পথে যাইতে পারিতেন তাহা হইলে অনায়াসে সভ্য জনপদে উপস্থিত হইতেন কিন্তু তাহা না হইয়া মনের চঞ্চলতায়, অন্ধকারের আধিক্যতায় সুপথ হারাইয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে প্রাণ ভয়ে সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমশঃ দূর বনে গমন করিতে লাগিলেন। রত্নমালাকে বিদায় দিয়া নগবালা কৌশলে চন্দ্রচূড়কে, রত্নমালার অনুসন্ধানে ক্ষান্ত রাখিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

উদ্যোগ।

যুবরাজ হংসকেতু স্ত্রীপুত্রে অলঙ্কৃত হইয়া নিজরাজ্যে আগমন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া প্রকৃতি পুঞ্জ আনন্দ সমুদ্রে ভাসমান হইল। মনের উল্লাসে স্ব স্ব আবাসে অশেষবিধ উৎসব ক্রিয়া আরম্ভ করিল। দীপমালায় সুশোভিতা নগরী গান বাদ্য রঙ্গরসে আনন্দময়ী হইয়া উঠিল। নানা স্থানে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল। কেহ কহিল আমাদিগের রাজার ন্যায়, ন্যায়পর পরম ধার্ম্মিক নরপতি প্রায় নয়ন গোচর হয় না। বিচারে এমনই অপক্ষপাতী যে, প্রাণাধিক পুত্র কিম্বা পরমারাধ্য গুরুজনও, অপরাদ্ধ হইলে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কার নিয়তই হইয়া থাকে। বর্ণ কিম্বা ধর্ম্ম নিবন্ধন পদ-প্রাপ্তির কোন অসুবিধা রাখেন নাই। প্রজার সুখ সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধন জন্য রাজার যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহার কিছুই অভাব নাই। প্রজাগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে সতত ব্যস্ত, কোন কার্য্যেই স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। বিরক্তিকর কর-স্থাপন করিয়া প্রজার হৃদয়রক্ত শোষণ করাকে মহাপাপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। বল-দর্পে দর্পিত হইয়া অধর্ম্মপথে পদার্পণ করাকে মহানরক বিবেচনা করিয়া থাকেন। অনর্থক রাশি রাশি অর্থ দিয়া প্রধান পদাবলম্বীর উদর পোষণ করিয়া প্রকৃতি-রক্ত শোষণ পুর্ব্বক ক্ষতিপূরণ করেন না। অনর্থক সমর ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া রাশি রাশি ধনক্ষয় করিয়া প্রাণ-প্রতিম প্রজা সকলকে পথের কাঙ্গাল করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। একের ব্যয়-

তার অন্যের শিরে প্রদান করিয়া প্রভূত পাপরাশি সঞ্চয় করিতে নিতান্তই দুঃখিত। স্বার্থপর বিচারপতিদিগের স্বার্থপরতায় নিতান্তই ব্যথিত হয়েন। বাজীকরের ঐন্দ্রজালের ন্যায় অপদার্থ চিহ্ন বা অসার উপাধি দিয়া কাহাকেও ভ্রম-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া হাবু ডুবু খাওয়ান্ না। স্পষ্টবাদী তেজস্বী মহাপুরুষের তেজক্ষয় জন্য, চোরের কুক্কুরকে মাংস দেওয়ার ন্যায়, ধনদান বা পদপ্রদান দ্বারা তাঁহার মুখবন্ধ করিতে কখনই ইচ্ছা করেন না। সামান্য মনুষ্য হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের জীবন পর্য্যন্তকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। কোন রাজপুরুষই বানর, ভল্লুক, শৃগাল, কুক্কুর বলিয়া কাহাকেও নিপাত করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। পাদুকাযুক্ত নিদারুণ পাদ প্রহারে কাহারও মৃত্যু ঘটাইলে তাঁহার আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই। কেহ, বলপূর্ব্বক কাহারও সতীত্ব নষ্ট করিলে তাহার মৃত্যু অবধারিত আছে। আর এক সৌভাগ্যের বিষয় এই মহারাজ হংসকেতুর রাজ্যে প্লীহা যকৃৎ ফাটিয়া কেহ অকাল মৃত্যুর মুখ দর্শন করে না। আমাদের রাজার পুণ্যফলে এ-রাজ্য সুখময় রাজ্য। প্রজা সকলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেব-তার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। তাঁহার শত্রু নাই। সাবধান হইয়া তাঁহাকে রাজ পথে ভ্রমণ করিতে হয় না। ভাই সকল! আর দর্শন করি-য়াছ, প্রজা সকলকে বানিজ্য কার্য্য, কৃষি কার্য্য; শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞাপন শাস্ত্র, সৈনিক কার্য্য শিক্ষা দিতে কেমন মনের সহিত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের নিকট কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি, এমন ন্যায়বান্ ভূপতি দীর্ঘজীবী হইয়া পরমসুখে রাজ্য সুখ সম্ভোগ করুন।

কোন স্থানে কৃষকগণ দলবদ্ধ হইয়া নরপতি সম্বন্ধে নানা কথার আন্দোলন করিতেছে। কেহ কহিতেছে—মোল্লের পো! আজ্ আমা-দের রাজার বেটা রাজা আস্‌বে, কত ধন বিলাবে, কাল্‌তো প্যাট্‌টা ভোরে মোণ্ডা মিটুই ঠুসে জীউটোকে ঠাণ্ডা ক'রবো। এমন রাজা হবা না। লোকে রাম রাজ্যির কথা বলে বটে, কিন্তু মোল্লের পো; আস্‌গার

রাজার মোতন রাজুত্তি কোন বেটা মন্দের পো কত্তি পারবে না। খা বল আর ঝাকর, মুই বলি, য়্যার মাপিক হবা না। মোল্লের পো কহিল—সত্যি ব'লেচিস্ সদ্দারের ছাবাল, তোম্‌গার বাবা নাকি সদ্দারি ক'রে কত বেটা হেকিমের নাককান কেটে ঘোড়া লেগ্‌য়ে গ্যাচে, তুই তার বেটা, বুদ্ধি তো কম নয়, আচ্ছা আন্দাজ ক'রেচিস্, দশার বেটা রামচন্দর্ ভাল রাজা হ্যালো বটে—কিন্তু তার বুদ্দিটে বড় মোটা ছ্যালো; বুদ্ধির দোষে মাগ হেরয়ে কেঁদে কেঁদে প্রাণটা গ্যাচে। আর এক রাজা ছ্যালো যুজিষ্টির—সেটার ক্যানতু হায়াপিত্তি নাই। পাঁচ ভাইত্তি যোগ ক'রে একটা মাগ নে ঘর কত্তো। মাগি-কি শক্ত-গা। অপর চাষা কহিল, আরে পাঁচটা তো পাঁচটা, একটা মাগিন্ পঞ্চাশ-টাকে জব্দ কত্তি পারে। ও-শালার জাত্‌কে, কি পেয়েচিস্! ঐ যে ঘোম্‌টা দিয়ে কুঁড়ের ভ্যাতোর চুপ্‌টী করে ব'সে থাকে, শালা ছাবাল খাবার যোম্। ইচ্ছে ক'রে য়্যাড্‌ডা চড়ে যমের বাড়ী পেট্‌য়ে দি। তার্ পর কি বলছিলি বল্—ও-বাবা!! গুড়ম্ গুড়ম্ ক'রে যে কামান পড়্‌ত্তি লাগ্‌লো। অপরে কহিল, ওরে রাজা আস্‌বার সময় হ'ত্তি লেগেছে তাই তোপ লাগ্‌চে।—মন্দের পো চল্ আম্‌রা দেখ্‌ত্তি যাই। অন্যে কহিল, আরে ভাই আস্‌ত এখনও বহুৎ দের্, আজ্ বড় মজার দিন্, মোল্লের পো! তোর বাবু সেই কপিতেগুলো গা, আর আমরা নেচে নেচে দোয়ারকি করি। সকলে—আচ্ছা ব'লেচিস্ ভাই; ধর্‌গো মোল্লের পো ধর্—মোল্লের পো আরম্ভ করিল——

ভোলা মন হরি বলরে—রে ভোলা মন হরি বল রে—
দিন গেল রাত্তির গেল, গেল যৌবন ব'য়ে।
না ভজিলি রাধা কেষ্ট গোঁড়া ব'ষ্টোম হ'য়ে॥ ভোলামন—
মাগ্ বল ছাবাল বল কেউ কারু ভাই নয়।
চোক্ বুজ্‌লেই চার্ দিক্‌টি অন্ধকারময়॥ ভোলা মন—

রাজার শক্রু হ'য়োনাকো বড় পাপ তায় জানি।
ক্ষিদের সময় রম্ন দ্যাচ্চে তেষ্টার সময় পানি ॥ ভোলা মন।
সূর্জ্যিবংশে ডিলিপ ব'লে ছ্যালো এক রাজা।
তার ছাবাল বজ্জাত্ হ'য়ে জ্বালাতো সব পেজা ॥ ভোলা মন।
পাপের জোরে নরক দেকে ও—গু—ও—গু ব'লে।
তার ছাবাল্কে ওগুবংশ সকল লোকে ব'লে ॥ ভোলা মন।
ওগুবংশে ভগীরথ গঙ্গা এনে ঘরে।
বেম্মশাঁপে ভস্মবংশ পাঠায় স্বগ্গ পুরে ॥ ভোলা মন।
ঐ বংশে অজার বেটা দশরথ তার নাম।
তার আবার চারি বেটা বড়টির নাম রাম ॥ ভোলা মন।
পোলোর বেটা বিশে ধোবা রাবণ তার ছেলে।
সীতে হ'রে নিয়ে সব বেটার মাথা খেলে ॥ ভোলা মন।
তার পরেতে ভীষ্মের বেটা পাণ্ডু রাজা হ'ল।
বিয়ে কল্লে বটে কিন্তু ভোগে নাহি এল ॥ ভোলা মন।
তার মেগের প্যাটে হ'ল পাঁচের পাঁচটি ছেলে।
তারাই শেষে ভারতের রাজুত্তি টে পেলে ॥ ভোলা মন।
রামের বেটা কুশের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হ'ল।
হনুমানের হাতে সবাই যোমের বাড়ী গেল ॥ ভোলা মন।
সেই হ'তে এই দেশে রাজার ছড়াছড়ি।
মন কসা কসী ক'রে গেল যোমের বাড়ী ॥ ভোলা মন।
এখন আমৃগার রাজার বেটা,সব রাজার সেরা।
ধনেমানে চেলে ডেলে পেজার ঘর ভরা ॥ ভোলা মন।
ভগমানের কাছে সবাই ডাকে হাততুলে।
রাজার বেটা রাজা যেন থাকে কুতূহলে ॥

ও-মোল্লের পো ! থাম্ থাম্ ; এত গোল উঠ্‌লো কিসের ? এ কান্নার গোল না ? ঐ দেখ কাঁন্নায় যেন রাজ বাড়ী ভ'রে যাচ্চে ; 'রাস্তার আলো নিব্‌চে, কি-হ'লো, চল্ সব রাজবাড়ী চল্। এদিকে ঐ-দিন রাত্রি নয় ঘটিকার সময় কয়েক জন অশ্বারোহী, দারুণ-নৈরাশ-ম্লান-হৃদয়ে রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া যুবরাজ হংসকেতুর অশুভ সংবাদ প্রদান করিল। রুদ্রদেব শ্রবণমাত্র বিসংজ্ঞ হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। মন্ত্রীগণ বহুযত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বহুবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত নগরে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে প্রজা সকল হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। শোক দুঃখ ক্রোধজনিত প্রতিধ্বনিতে নগরী শব্দিত হইতে লাগিল। মহারাজ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন এমন সময়ে সেনাপতি প্রতাপসিংহ কর যোড়ে নিবেদন করিলেন মহারাজ ! আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, অনুমতি করিলে সৈন্য সজ্জা করি। যতক্ষণ না আমি নরাধম বনবাসী দস্যুর প্রাণ দণ্ড করিয়া যুবরাজের চরণ দর্শন করিতেছি, ততক্ষণ আমার মনে শান্তি সঞ্চার হইতেছে না। রুদ্রদেব কহিলেন প্রতাপ ! আর অনুমতির অপেক্ষা নাই। চল, আমিও তোমাদের সহিত গমন করিতেছি। সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে বল। সেনাপতি কহিলেন, প্রভো ! সৈন্য সকল বহুক্ষণ প্রস্তুত হইয়া অনুমতির অপেক্ষায় উৎসুক-চিত্তে কালযাপন করিতেছে। মহারাজ রুদ্রদেব রোদন পরায়ণা রমণী সকলকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সৈন্য সেনাপতি সমভিব্যাহারে বনোদ্দেশে গমন করিলেন। রাজ্যবাসী অস্ত্রধারণক্ষম প্রজামাত্রেই উৎসাহের সহিত মহারাজের অনুগামী হইল। সকলে ভয়ানক ত্বরার সহিত কিছুদিন পরেই, বনপ্রান্তে উপস্থিত হইল। ও-দিকে অপর সৈনিক পুরুষ, বিজয়পুরে এই সংবাদ প্রদান করিলে সকলে অপার দুঃখ-সমুদ্রে-ভাসমান হইল। যুবরাজ বিনয় ত্বরায় অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া রুদ্রদেবের সহিত মিলিত হইলেন। সমুদ্র সদৃশ অসংখ্য সৈন্যের কোলাহলে চতুর্দ্দিক্

শঙ্কায়মান হইতে লাগিল। ক্রমে বর্ষা শেষ হইয়া শরতের লক্ষণও প্রকাশ পাইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সমর।

এক দিন প্রতাপ সিংহ, সমবেত সৈন্য সকলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়তম সৈনিক সকল! আজি বীর-দর্পে দর্পিত হইয়া নিজ নিজ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া যুবরাজকে উদ্ধার করতঃ নিরুপম আনন্দ সুখসম্ভোগ কর, এ-পর্য্যন্ত মহারাজ তোমা-দিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, আজি পুত্রোচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আনন্দ-সলিলে অবগাহন কর। আজি রাজ বিদ্রোহী দুরাচার দস্যুর প্রাণ দণ্ড করিয়া ভূমণ্ডলে চিরকীর্ত্তি সংস্থাপিত কর। তোমাদিগের বলবীর্য্য পৃথিবীতে চির বিখ্যাত; তোমরা পবিত্র আর্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাক, যেন সেই নামে কলঙ্কার্পণ করিও না। দেহে জীবন থাকিতে সমরে বিমুখ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ; আর্য্য সৈন্য কখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। তোমাদিগের নির্ম্মল যশশ্চন্দ্রে পৃথিবী আলোকময়ী; দুরাচার দস্যু শৃগাল হইয়া সিংহ-কেশর আকর্ষণ করি-য়াছে। তাহার আর রক্ষা নাই। প্রিয়তম সৈনিক সকল! এই-সময় একবার আমাদিগের পূর্ব্বোৎপন্ন বীরগণকে স্মরণ কর। তাঁহা-দিগের অদ্ভুত কার্য্যাবলী মনে মনে চিন্তা করিয়া তদনুকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। সমরে মৃত্যু স্বর্গের কারণ ইহা যেন বিস্মৃত হইও না। তোমাদের দেবপূজিত অঙ্গ যেন নরাধম বন্যগণ স্পর্শ করিতে সক্ষম না হয়। লুণ্ঠন যাহাদিগের ব্যবসায়, অবিচার যাহাদিগের সহচর

স্বার্থপরতা যাহাদিগের ভগিনী, শঠতা যাহাদিগের গেহিনী, অভক্ষ্য যাহাদিগের ভক্ষ্য; কদাচার যাহাদিগের সদাচার, স্ত্রী যাহাদিগের দেবতা, আগম্যা যাহাদিগের গমনীয়া, রাক্ষসী যাহাদিগের মাতা, বানরবৎ মনুষ্য যাহাদিগের পিতা, লম্ফ যাহাদিগের বীরত্ব, গিরিগুহা যাহাদিগের বাস গৃহ, উল্কী যাহাদিগের অঙ্গভূষণ, সুরা যাহাদিগের পানীয় জল, বৃক্ষশাখা যাহাদিগের আসন, সেই দুরাচার বন্যগণ আর্য্য নামে কলঙ্কার্পণ করিতেছে, তোমরা কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিতেছ। একবার মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া মনে মনে ভাবিয়া দেখ দেখি, উৎসন্ন যাইতে কি বাকী আছে। বন্যগণ, মহারাজাধিরাজকে রুদ্ধ করিয়াছে। আর্য্যগণ থাকিতে রাজবল নষ্ট হইল। হায়! ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে। এরূপ ব্যাপার দর্শন করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। আজি আমরা অসভ্য বন্যগণ ভয়ে ভীত, আজি আমরা বন্য বানরগণের লাল-মুখ-দর্শনে বিহ্বল, আজি আমরা পশু যোনিজগণের প্রতাপে অপমানিত, হা ধিক! আমাদিগের মরণই মঙ্গল!! প্রিয়তম সৈনিক সকল! বীরদর্পে দর্পিত হইয়া করে করাল করবাল গ্রহণ পূর্ব্বক পরমোৎসাহে সমর সাগরে অবগাহন কর। সজোরে সংগ্রামে নিমগ্ন হইয়া নিমগ্ন প্রিয় পদার্থ সকল উদ্ধার করতঃ পবিত্র আর্য্য নামকে পবিত্র রাখিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর। আর্য্য সেনাগণ স্বভাবতঃ নির্ভীক, অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় সেনাপতির প্ররোচনা বাক্যে দ্বিগুণতর দর্পিত হইয়া হর! হর! শব্দে অরণ্য মধ্য দিয়া বিপক্ষ সেনার অভিমুখে ধাবিত হইল। চন্দ্রচূড় সেনাপতি চণ্ডেশ্বরও অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সমর স্থলে উপস্থিত হইল। দুই দলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। কামানের গভীর গর্জ্জনে, হস্তীর বৃংহণে, অশ্বের হ্রেষা রবে, দর্পোদ্ধত বীরগণের কঠোর নিনাদে, পতনোম্মুখ সেনাগণের মরণোচ্চ-কাতর শব্দে, অস্ত্রের ঝণ্ ঝণ্ ধ্বনিতে, বনভূমি বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বারুদ-

ধূমে অরণ্যের অন্ধকার প্রগাঢ় হইল। এই অবসরে চণ্ডেশ্বর, রুদ্র। মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রুদ্রদেবকে আক্রমণ করিল। রুদ্রদেব কহিলেন আয়! নরাধম আয়! মদীয় প্রদীপ্তক্রোধানলে তোর্ শোণিতাহুতি প্রদান করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করি। চণ্ডেশ্বর কহিল, অগ্রে নিজ জীবন রক্ষা কর, পশ্চাৎ যাহা করিবার তাহাই করিও। এই বলিয়া সবলে প্রহার করিল। কিন্তু রুদ্রদেবের করস্থ চর্ম্মে লাগিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। মহারাজ যে মাত্র আঘাত পাইলেন অমনি বিদ্যু-দ্বৎ অসি চালনা করিয়া, চণ্ডেশ্বরকে প্রহার করিলেন। এই আঘাতে সেনাপতির বর্ম্ম ভেদ হইয়া শরীরে লাগিল এবং বেগে রুধির ধারা বহিতে লাগিল। চণ্ডেশ্বর রাজ দত্ত আঘাতে ব্যথিত হৃদয় হইয়া ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ বর্ষা নৃপতির বক্ষঃস্থলে বসাইয়া দিল। বর্ম্ম-ভেদ হইয়া বক্ষে আঘাত লাগিল। সেনাপতি প্রতাপসিংহ দূর হইতে রাজার বিপদ দর্শন করিয়া বেগে আগমন করত এক আঘা-তেই চণ্ডেশ্বরকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য আঘাতে তাহার অশ্বকেও খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ প্রহার বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। সেনাপতি তাঁহাকে লইয়া শিবিরে প্রস্থান করিলেন। অন্য দিকে যুবরাজ বিনয়, সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে চণ্ডচূড়কে বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাহার পলাইবার আর উপায় ছিল না। চণ্ডচূড় জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ঘোরতর সমর করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে তাহার পার্শ্বচর সৈন্য সকল হতজীবন হইয়া ভূতলশায়ী হওয়ায় চন্দ্রচূড় বিপক্ষ হস্তে পতিত হইল। অবশিষ্ট বন্যগণ প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিল। বিনয়ের সৈন্যদলে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। পরে এক দল তেজস্বী অশ্বারোহী বেগে গমন করিয়া বন্য ভূপতির বাসগৃহ বেষ্টন করিয়া তত্রস্থ বন্যগণকে পশুর ন্যায় নিপাত করতঃ যুবরাজ হংসকেতুকে কারামুক্ত করিল। যুবরাজ তৎ-ক্ষণাৎ এক সুসজ্জিত বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া পিতৃ দর্শনে

স্থান করিলেন এবং অবিলম্বে পিতৃ শিবিরে উপস্থিত হইয়া মহা যাজ চরণ বন্দনা করিলেন, বিনয় এবং প্রতাপকে আলিঙ্গন লেন। মহারাজ রুদ্রদেব পুত্রমুখ দর্শনে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আর কহিলেন, আমার প্রিয়তম পুত্রবধূ রত্নমালাকে পুত্রের সহিত ত্বরায় আমার নিকট আনয়ন কর। মহারাজের আদেশের পূর্ব্বেই রত্নমালার অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। কিন্তু নগবালার মুখে তাঁহার প্রস্থান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কেহই সাহস করিয়া তৎসংবাদ প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই। এক্ষণে অগত্যা তৎসংবাদ মহারাজকে অবগত করাইল। যুবরাজ হংসকেতু তচ্ছ্রবণে ম্রিয়মাণ হইলেন এবং বৃদ্ধরাজা চতুর্দ্দিক শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শিশু নগেন্দ্রেরও কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। বহু অনুসন্ধানের পর কেবল এইমাত্র জানিতে পারিলেন। বন্যগণ শ্যামার সহিত নগেন্দ্রকে কোথায় লইয়া গিয়াছে। দুঃখের উপর দুঃখ, সমরে জয়লাভেও সুখোৎপত্তি হইল না।

রুদ্রদেব, সমরে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, ক্রমে তাহা গুরুতর হইয়া আসিল। প্রবল জ্বরের উদয় হইল। ক্রমে মহারাজ জ্ঞান হারাইলেন। যুবরাজ হংসকেতু গতিক মন্দ দেখিয়া ধারা নগর হইতে মাতা জগদ্ধাত্রীকে আনাইলেন। মহারাণী আসিয়া মুমূর্ষু মহারাজকে নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে মহারাজের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া আসিল। বাঁচাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করা হইল কিন্তু সকল নিষ্ফল হইয়া গেল। বৃদ্ধরাজা পুত্রক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া পরম পিতার চরণ যুগল ধ্যান করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করিলেন। রোদন ধ্বনিতে অরণ্যানী পরিপূর্ণ হইল। যুবরাজ হংসকেতু হাহাকার রবে হৃদয়ে করাঘাত করিয়া মৃত পিতাকে অঙ্কে ধারণ করতঃ বিলাপ আরম্ভ করিলেন, কহিলেন— আজি আমার জগৎশূন্য হইল। স্নেহের পূর্ণামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন।

আজি আমার দেবের দেব, পরম দেব আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। কোথায় যাই কি করি, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে মহারাজ জীবিত হইবেন। রে দুরাত্মন্ প্রচণ্ড চন্দ্রচূড়! তোর্ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। আজি তুই আমার মস্তকমণিকে বিনষ্ট করিয়া যথার্থই আমায় কাঙ্গাল করিলি। পিতঃ! পিতঃ! মহারাজ! প্রজাপালক পরম ধার্ম্মিক মহারাজ! অধন্য সন্তান হংসকেতু আহ্বান করিতেছে উত্তরদানে আমার তাপিত জীবন শীতল করুন। আপনার অভাবে আমার কি গতি হইবে। এ-পাপাত্মা সন্তানের উদ্ধারের জন্য নিজ জীবন প্রদান করিয়া আমার কি সর্ব্বনাশই না করিলেন। দুর্দ্দান্ত বন্যগণের নিষ্ঠুর দণ্ডে শত সহস্র বৎসর অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও 'আপনি জীবিত আছেন,' ইহা শ্রবণ করিয়া যদি আমি প্রাণত্যাগ করিতাম, তাহাও আমার পরম সুখের হইত। কেন আপনি, এ-কাপুরুষকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন? আমা হইতে আপনার কি সুখভোগ হইল? এ-নরাধম পুত্র, পুত্রপদবাচ্য নহে। পিতঃ! হৃদয়ে এই এক দারুণ দুঃখ রহিয়া গেল যে আমার নিমিত্ত আপনি জীবন হারাইলেন। মরিলেও আমার এ দুঃখ বিমোচন হইবে না। চিতানলেও আমার এ দুঃখ ভস্মীভূত হইবে না। যে নরাধম কুসন্তান হইতে পরমারাধ্য পিতা মহাশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গতাসু হয়েন, সে সন্তান, সন্তান নহে, ভয়ানক শত্রু; তাহার নাম গ্রহণেও প্রভূত পাপরাশির সঞ্চয় হয়। পিতঃ! এই দেখুন—এই আমার হৃদয়ে দাবানল সদৃশ দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতেছে। একবার মধুর স্বরে সান্ত্বনাবারি সেচন করিয়া সুশীতল করুন। দেবের দেব! সাক্ষাৎ শরীর ধারিন্ মদীয় পরমেশ্বর! এ-হতভাগ্য নয়ন-নীরে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া কাতর স্বরে পিতঃ! পিতঃ! শব্দে আহ্বান করিতেছে একবার উত্তরদানে কৃতার্থ করুন। যদি কাপুরুষ পুত্রকে উত্তর দিতে ঘৃণা বোধ হয়, তবে মদীয় জননীর প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করুন। হা প্রিয়ে

রত্নমালে ! তুমি এ সময় কোথায় রহিলে ? আসিয়া দর্শন কর, তোমার আরাধ্য দেবতা আজি ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। জীবনাধিক শিশু পুত্র নগেন্! একবার এ সময় দেখা দিয়া আমার তাপিত জীবন শীতল কর। বিনয় প্রভৃতি মহাত্মাগণ বহুবিধ প্রবোধ বাক্যে যুবরাজকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে মহারাজের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। দেখিতে দেখিতে চিতা প্রজ্জ্বলিত হইল। মহারাণী জগদ্ধাত্রী দেবী দর্শক বৃন্দকে বহুতর ধন দান করিয়া মহারাজের সহিত অগ্নি প্রবেশ করিলেন। হংসকেতু বন মধ্যেই পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে চিতার উপর এক প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তৎসংযুক্ত এক রঙ্গভবন প্রস্তুত করাইয়া শিব-শক্তি মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। তৎপরে পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তৎস্থানে এক নগর স্থাপনের অনুমতি দিলেন। পরে বিচারার্থে দস্যু চন্দ্রচূড়কে পূর্ব্ব রক্ষিত কারাগার হইতে আনয়ন করিলে, নগবালা আসিয়া রত্নমালার সম্মুখে স্বামীর বিচার প্রার্থনা করায় আপাততঃ বিচার বন্ধ থাকিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রত্নমালার অনুসন্ধান।

সমরাবসানে হংসকেতু স্ত্রী পুত্রের অনুসন্ধানের নিমিত্ত বনবিভাগে বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিলেন এবং কহিয়া দিলেন কোথাও কিছু সন্ধান পাইলেই তৎক্ষণাৎ আমাকে তৎ সংবাদ প্রদান করিবে। তাহারা যে আজ্ঞা মহারাজ ! বলিয়া সত্বর প্রস্থান করিল। অগ্রে

আমি "শুভসংবাদ প্রদান করিতে পারিলে" বিশেষ পুরস্কৃত হইব এই বাসনায়, সকলেই প্রাণ-পণে অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিল। এই রূপে কিছুদিন অন্বেষণ করিতে করিতে দুইস্থানে দুই চিহ্ন দর্শন করিয়া রাজানুচরগণ, প্রবল দুঃখ শোকে ম্রিয়মাণ হইল। মহারাজকে, কে-এ-ভয়ানক সংবাদ প্রদান করিবে এই ভাবিয়া সকলেই বিশেষ কাতর হইল। অবশেষে চিত্তে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে করিতে হংসকেতুকে নিবেদন করিল, মহারাজ! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ভয়ানক চিহ্নদ্বয় যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহা আপনি আগমন করিয়া স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করতঃ সত্যাসত্য অবধারণ করুন। যুবরাজ বিনয় এবং মহারাজ হংসকেতু, অনুচরগণ সহ অবিলম্বে নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া যাহা দর্শন করিলেন তাহাতেই জ্ঞান হারাইলেন। হংসকেতুর যাহা কিছু ধী শক্তি ছিল এইবার তাহা অপগত হইল; ধৈর্য্যবিচ্যুত হইল, এবং সংসার শূন্যময় দর্শন করিতে লাগিলেন। মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। দুই চক্ষে জল আসিল। হা! হতোঽস্মি বলিয়া ধরাতলে পতিত হইয়া বিসংজ্ঞ হইলেন। যুবরাজ বিনয় রোদন করিতে করিতে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে সযত্ন হইলেন। মহারাজ সংজ্ঞালাভে সেই ভয়ানক ব্যাপার আরবার দর্শন করিতে লাগিলেন, দেখিলেন রাশীকৃত অস্থি সম্বলিত অঙ্গার পতিত রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষ-কাণ্ডে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "আমি মহারাজ হংসকেতুর রাজ মহিষী রত্নমালা, পতি-পুত্রশোকে বিহ্বল এবং বন্যগণের দুর্ব্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সতীত্ব রক্ষার জন্য এই চিতানলে ভস্মীভূত হইলাম।" তদনন্তর হংসকেতু তথা হইতে বহুদূরস্থ দ্বিতীয় চিহ্ন স্থানে গমন করিয়া এক বৃক্ষকাণ্ডে খোদিত এই কয়েকটি কথা পাঠ করিলেন, "বনবাসি সকল! তোমরা কেহই এই স্থানে অবস্থান করিও না, ইহার অনতিদূরে পর্ব্বতগুহা মধ্যে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বাস করে, মহারাজ হংসকেতুর শিশু-পুত্রের সহিত

পরিচারিণী শ্যামাকে এই স্থানে ব্যাঘ্রে বিনষ্ট করিল। অপহারী বনবাসীর কোন কার্য্যেই আসিল না"। হংসকেতু পুনঃ পুনঃ ঐ কথাগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। দুই চক্ষে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। কাতর বচনে কহিলেন, বিনয়! প্রিয়তম বিনয়! আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! আর আমার সংসারে আবশ্যক কি? মরণই মঙ্গল; আমার তুল্য হতভাগ্য জগতে অতি বিরল; পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। এ-অসার দেহ-ভার-বহনের আর আবশ্যক কি? চিতা প্রজ্জ্বলিত কর, আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেহের সহিত সমস্ত মনস্তাপ ভস্মীভূত করি। আর এ-পাপ জীবন ক্ষণকালও রাখিব না। আর আমি এ-মুখ জগতে কাহাকেও দেখাইব না। প্রিয়তম নগেন! আমার অন্ধের যষ্টি নগেন্! আমার দেহের বল-বুদ্ধি ভরসা নগেন! তুমি এ-হতভাগ্য পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ? তোমার অর্দ্ধ বিনির্গত মুক্তাকলাপীকৃত দন্ত পংক্তি সম্বলিত বিমোহন হাস্য, আর কি আমায় আনন্দিত করিবে না? তোমার অমৃতায়মান অর্দ্ধোচ্চারিত বচন পরম্পরা, আর কি আমার শ্রবণ বিবরে অমৃতধারা বর্ষণ করিবে না? আর কি তোমার ধুলি ধুসরিত অঙ্গযষ্টি আমার পাপদেহকে পবিত্র করিবে না? তোমার মোহিনীমূর্ত্তি আর কি আমার নয়ন পথে পতিত হইবে না? তোমার সেই হাস্য, সেই বাক্য, সেই নৃত্য, সেই সেই অঙ্গভঙ্গি এক্ষণে যে আমাকে সপ্তপাতাল তলে নিক্ষেপ করিতেছে। আমার ন্যায় যে হতভাগ্য তোমাধনে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই আজি আমার এ-কষ্ট অনুভব করিতে সমর্থ; অন্যে নহে। উঃ কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা! প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হইল। পাপ জীবন! আর কেন দেহ হইতে বহির্গত হইয়া আমাকে নিষ্কৃতি দাও। প্রিয়ে রত্নমালে! তুমিই ধন্যা, স্বর্গবাসিনী হইয়া সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছ। হা প্রিয়ে! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছ?

তবে আমার আর থাকিবার আবশ্যক কি? তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, দেহের শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, রাজকার্য্যে প্রধান মন্ত্রী, ক্রিয়াকলাপে প্রিয়-সখী, গৃহকার্য্যে গেহিনী, তোমার বিচ্ছেদে আমি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব? আমি অনেক পুণ্যফলে তোমাকে লাভ করিয়া-ছিলাম, আজি কি পাপে তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম? তোমার তুল্য সতী পতিব্রতা রমণী আমার ন্যায় নরাধমের অযোগ্য বলিয়াই কি ভগবান তোমায় বৈকুণ্ঠধামে লইয়া গিয়াছেন? প্রিয়ে! রমণী-হীন সংসার শ্মশান ভূমি; যে গৃহে তোমাদের অধিষ্ঠান নাই, সে গৃহ অরণ্য; যে গৃহ তোমাদিগের চরণ ধূলিতে পবিত্র না হয়, সে গৃহ, গৃহই নহে; যে গৃহে তোমাদিগের মধুর হাস্য নাই, সে গৃহ নীরস; প্রাণ-সমে! তোমরাই পুরুষের বল, উৎসাহের মূল, ধর্ম্মের আদি কারণ, সংসার বন্ধনের দৃঢ় বন্ধনী, যশের সেতু, উন্নতির হেতু, আশার আশা, ভরসার ভরসা, শক্তির শক্তি; পুরুষে তোমাদিগের চরণ ধূলিতেই পবিত্র, তোমাদিগের অঙ্গ স্পর্শেই বিশুদ্ধ; তোমাদিগের অধর সুধাপানেই অমর; কি গৃহে কি বনে কি রণে সকল সময়েই তোমরা রক্ষাকারিণী; যুদ্ধস্থলে শত্রু, যাহাদের শিরশ্ছেদে উদ্যত হইয়াছে তোমরাই তাহাদিগের বল; তাহারা তোমাদের মুখপদ্ম স্মরণ করিয়াই প্রতি-প্রহারে সমর্থ; শত্রু নিপাতনে পারগ; সতী পতিব্রতা স্ত্রী, পুরুষের পরমধন; তাহাকে হৃদয়ে রাখিলেও ব্যথা বোধ হয় না। স্বহস্তে তাহার চরণ যুগলের সেবা করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। তাহার চরণ ধূলিও স্বামীর প্রিয়বস্তু; আমার হৃদয়-সরোবরের কনক-নলিনি রত্নমালে! আমার হৃদয় অন্ধকার করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ? তুমি আমার রাজলক্ষ্মী, আজি আমি লক্ষ্মী ভ্রষ্ট ও রাজ্য ভ্রষ্ট হইলাম। হা প্রিয়ে! হা প্রিয়তমে! হা মধুর ভাষিণি! হা হৃদয়-দুঃখ-ভার-বিনাশিনি চন্দ্রাননে! একবার এই সময় আগমন করিয়া বচন-সুধা দানে আমায় বাঁচাও। উঃ কি যন্ত্রণা! সংসার শূন্য! দেহ শূন্য! জীবন শূন্য!

আর বাঁচিয়া ফল কি? এই কথা বলিতে বলিতে বিগত চেতন হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। বিজয় বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মহারাজ হংসকেতু; সেনাপতি প্রতাপসিংহকে কহিলেন, প্রতাপ! প্রিয়ার শ্মশান ভূমিতে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাও। আর ধারা রাজ্যে গমন করিয়া রাজচ্ছত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য শাসন কর। যদি আমার নগেন্ জীবিত থাকিয়া কোন কালে ধারা রাজ্যে গমন করে, তবে তাহাকে রাজ্যভার অর্পণ করিও। দস্যু রাজ্যে নগর নির্ম্মাণ করাইয়া তোমার পুত্র অমরসিংহকে তাহার শাসনভার প্রদান করিও। দস্যুপতি চন্দ্রচূড় আপাততঃ কারাগারেই অবস্থান করুক। বিনয় তুমি স্বরাজ্যে গমন কর। আর আমি গৃহে যাইব না। এই বলিয়া নীরব হইলেন। সকলে মহারাজকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফলই হইল না। মহারাজ হংসকেতু সুযোগ ক্রমে সকলের চক্ষে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কোথায় যে গমন করিলেন, কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। যুবরাজ বিনয় অগত্যা গৃহে গমন করিলেন। মহারাজ অরিন্দম এবং রাজমহিষী এই বিপদ ঘটনায় অভিভূত হইয়া দারুণ রোগে উভয়ে জীবলীলা সম্পন্ন করিলেন। মহারাজ বিনয় নানাবিধ শোক দুঃখে সন্তপ্ত হৃদয় হইয়া কোনরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্র।

কিরাতরাজ রমাপতি অপুত্রক ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রকে আনিয়া প্রিয়তমা জায়া নবীনকালীকে অর্পণ করিলেন। নবীনকালী তাঁহাকে

অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শ্যামা সর্ব্বশোক বিস্মরণ পূর্ব্বক নগেন্দ্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিল। এইরূপে বহু দিন গত হইয়া গেল। কুমার দিন দিন শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় উপচীয়মান হইয়া পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। শ্যামা দেখিয়া শুনিয়া সুখিনী হইল এবং মনে মনে ভাবিল আমার যাহা বাঞ্ছনীয় ছিল তাহা ত সম্পন্ন হইল। এক্ষণে কুমার আত্ম-পরিরক্ষণে বিলক্ষণ পারগ হইয়াছেন। কি নব-বিকশিত-নলিনী-সদৃশ-মুখকান্তি! কি আবক্র যুগ্ম ভ্রূযুগল! কি তরলায়ত-কমল-লোচন! কি সুন্দর-কপাল-ফলক! কি মনোহর মুক্তা-কলাপীকৃত-দন্ত পংক্তি। কি আরক্ত-কপোল-যুগল! আহা! মুখচন্দ্র দর্শন করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, যেন মধুরতা এবং গম্ভীরতা একত্র বিরাজ করিতেছে। কি আজানুলম্বিত-ভুজযুগল! কি জয়লক্ষ্মীর ক্রীড়াভুমি সদৃশ-বিশালায়তন-বক্ষস্থল! কি সারময় অঙ্গ-যষ্টি! স্বভাব—অশিষ্টতা, গম্ভীরতায় পরিপূর্ণ অথচ বিনয়ে পরি-শোভিত, বাপ আমার যে রাজপুত্র সেই রাজপুত্র; এমন রূপমাধুরী ত কখন দর্শন করি নাই। আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। এক দিন গোপনে পরিচয় প্রদান করিয়া, কুমার যাহাতে উত্তরকালে পিতৃ রাজ্যে গমন করিতে পারেন, আমাকে তাহার উপায় করিতে হইবে। শ্যামা কিরাতরাজ-ভয়ে এত দিন কুমারকে কোন পরিচয় প্রদান করে নাই। কিরাতরাজ "শ্যামাকে নগেন্দ্রের স্বস্থানবাসিনী কি না, এবং নগেন্দ্রের বিষয় কিছু অবগত আছে কি না" জিজ্ঞাসা করায় চতুরা শ্যামা উত্তরকাল চিন্তা করিয়া কহিয়াছিল, আমি ভিন্ন-স্থান-বাসিনী, অল্প দিনমাত্র রাজসংসারে নিযুক্ত হইয়াছি। আমি এ বালকের বিষয় কিছুই জানি না। কিরাতরাজ কহিয়াছিলেন, তুমি ইহাকে ক্রীত বালক বলিয়া পরে পরিচয় প্রদান করিলে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে। আর যদি পরিচয় না দিয়া "আমার পুত্র" ইহা, ইহার বোধ জন্মাইয়া দাও, তবে আমি তোমাকে বিশেষ পুরস্কৃত

করিব। শ্যামাকে গৃহে রাখিবার অন্য কারণও ছিল, নগেন্ শ্যামাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহার অভাবে বালকের অনিষ্ট ঘটনা সম্ভাবনা দেখিয়া কিরাতরাজ শ্যামাকে গৃহে আনিয়াছিলেন। শ্যামা এতাবৎকাল এমনই সাবধানে অবস্থান করিয়া আসিতেছে যে, কিরাত-রাজার মনে কোন সন্দেহই উপস্থিত হয় নাই। এক্ষণে বৃদ্ধ কিরাত-রাজ আপনার শরীর ভগ্ন হইল দেখিয়া নগেন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত করিয়া কিছু দিন পরে মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। শ্যামাও অবসর পাইয়া নগেন্দ্রকে তাহার প্রকৃত পরিচয় দানে সমুৎসুক হইল।

পাঠক মহাশয়! আমাদের নগেন্দ্র কিম্বা রত্নমালা কেহই লোকা-ন্তর গমন করেন নাই। ইহাঁদিগের অনুসন্ধানকারীগণের চক্ষে, ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্যই, বন্যগণ পূর্ব্বোক্ত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল।

এক দিন কুমার কার্য্যোপলক্ষে অন্তঃপুরে আগমন করিয়াছেন, এমন সময় শ্যামা তাঁহাকে একান্তে আহ্বান করিয়া কহিল, আয়ু-ষ্মন্! এই আসনে উপবেশন করুন। আমি আপনাকে আমার কয়েকটি মনের কথা নিবেদন করিয়া কথঞ্চিৎ মনের দুঃখ নিবারণ করি; এই কথা বলিতে বলিতে শ্যামা রোদন করিয়া ফেলিল। কুমার শ্যামার এই অভূতপূর্ব্বভাব-দর্শনে বিহ্বল হইয়া কহিলেন, শ্যামা-মা! তুমি রোদন করিলে কেন? তোমার নয়ন-নীর-দর্শন করিয়া আমি ম্রিয়-মাণ হইলাম। কি বলিবে বলিয়া নীরব হইলে কেন? কে তোমায় কি বলিয়াছে বল? কে কালভুজঙ্গিনীর গাত্র স্পর্শ করিয়াছে? কে-বা প্রজ্জ্বলিত অনলে হস্তক্ষেপ করিয়াছে? মা! কে তোমার কি করিয়াছে বল? তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করি। শ্যামা কহিল বাপ! কেহ আমার অপমান করে নাই। আমি আমার অদৃষ্ট দোষে রোদন করিতেছি। রোদনের গূঢ় কারণও আছে। আর আমি গোপন রাখিতে পারিলাম না। বাপ আমার! প্রজাপালক

পরম ধার্ম্মিক নরপতি হংসকেতু পুত্র নগেন্! বাপ আমার! দয়াশীলা দীন জননী সাবিত্রীউপমা রত্নমালা পুত্র নগেন্! আপনি আমাদিগের অনেক তপস্যার ধন, আপনি কিরাতরাজপুত্র নহেন। এই বলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খক্রমে একে একে সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিল এবং দস্যু-হস্তে পতন পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া প্রবলবেগে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

কুমার শ্রবণমাত্র বিসংজ্ঞ হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। শ্যামা সযত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিল। নগেন্দ্র রোদন করিতে করিতে কহিলেন, শ্যামা-মা! তুমি আমায় কি ভয়ানক সংবাদ শ্রবণ করাইলে, ইহাপেক্ষা আমার মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর ছিল; কেন তুমি আমার নিমিত্ত এত কষ্টভোগ করিয়া আমায় রক্ষা করিয়াছিলে? আমার মৃত্যু হইলে ত আজি এতাদৃশ ভয়ানক সংবাদ শ্রবণ করিতে হইত না। যদিও স্বর্গস্থ কিরাত মহারাজ আমায় সন্তানের ন্যায় প্রতি-পালন করিয়া আসিয়াছেন, যদিও মাতা নবীনকালী অপূর্ব্ব স্নেহে আমাকে লালন পালন করিতেছেন, তথাচ আমার অন্তঃকরণ জনক জননীর নিমিত্ত কাতর; মরুভূমি সদৃশ নীরস; আমার সকল থাকি-য়াও যেন কিছুই নাই। বাল্যকাল বরং কথঞ্চিৎ সুখের ছিল, আমার বর্ত্তমান কাল, আমাকে নিতান্তই ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। মনঃপ্রাণ সর্ব্বদাই দারুণ অসুখে অসুখিত আছে। শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে কিছুতেই চিত্তের প্রশান্তি নাই। আমি জীবিত থাকিয়া অনুক্ষণ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি অনেক সময় আমার মনোবেদনা তোমাকে জানাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াও জানি না কি কারণে জানাইতে অগ্রসর হইতে পারি নাই। আমি নিদ্রিত হইলেই স্বপ্ন-যোগে সন্ন্যাস-বেশধারী এক পরমসুন্দর বীরপুরুষকে দর্শন করি। তিনি প্রতি রজনী যোগেই আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে আলিঙ্গন দিয়া কপাল চুম্বন পূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করেন। সাদরে অঙ্কে

বসাইয়া হাস্যমুখে কত উপদেশ দেন, কত উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে হস্তাবর্ত্তন করত প্রস্থান করেন। তৎপরেই হৃদয় বিদারক ব্যাপার দর্শন করিয়া শোকদুঃখে ম্রিয়মাণ হই। এক অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্পন্না স্বর্গীয় দেবী, আলুলায়িত কেশে, মলিন বদনে রোদন করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়া আমাকে বক্ষে ধারণ করেন, আদরে আমার চিবুক ধারণ করিয়া অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা জননী-উচিত, স্ত্রীজাতি অভ্যস্ত, নিয়মানুসারে বারত্রয় মুখচুম্বন পূর্ব্বক নয়ন-নীরে বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া স্নেহপূর্ণ মধর স্বরে আহ্বান করতঃ কহেন, বাপ আমার কাঙ্গালিনীরধন! আমি অনেক তপস্যার ফলে এ মুখচন্দ্র দর্শন করিয়াছি। আমি, কত ব্রত, কত উপাবাস, কত আরাধন এবং কঠোর-নিয়ম-পালন করিয়া তোমা ধনে লাভ করিয়াছি। আয়্! ক্ষীরভরে স্তনযুগল ভারাক্রান্ত হইয়াছে, চাঁদমুখে স্তন দিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করি! এই বলিয়া মুখে স্তনদান করেন। আমিও মনের সুখে স্তন-নিঃসৃত অমৃত-ধারা পান করিতে থাকি। আর তিনি কহেন, বাপ! আমি রাজরাণী হইয়াও কাঙ্গালিনী; আমি তোমাধনে ধন-শালিনী হইয়াও দুঃখিনী; এই দ্যাখ্ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া আমার কি অবস্থা হইয়া গিয়াছে। এই দ্যাখ্ বন্যগণের দারুণ প্রহারে স্থানে স্থানে কালিমা পড়িয়াছে। বাপ! এই দ্যাখ্ বস্ত্রাভাবে বৃক্ষের বাকল পরিধান; হৃদয়রত্ন! কণ্ঠেরহার! নয়নমণি! এই দ্যাখ্ অন্নাভাবে শীর্ণকায় হইয়াছি। তিক্ত কষায় পল্বল বারি এবং পাদপপত্র, আমার পানীয় এবং ভোজনীয়; শুষ্ক তরুপত্র আমার শয্যা, বিহঙ্গিনীগণ আমার সঙ্গিনী, বন আমার রাজভবন; বাপ! আমি রাজমহিষী; মহারাজাধিরাজের প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী; তোমার ন্যায় পুত্রে পুত্র-বতী; তথাচ আমি অতি দীনা; বাপ! আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। তুমি সুখে থাকিলেই আমি সুখিনী; সাবধানে থাকিবে, কোনরূপ অনিয়ম করিয়া যেন রোগগ্রস্ত হইও না। তোমার

দীর্ঘ জীবন হউক। এই কথা বলিতে বলিতে মুখচুম্বন করিয়া প্রস্থান করেন। শ্যামা-মা! ইহাতে কি আমার হৃদয় ধৈর্য্য ধরে? এ-ঘটনায় কি চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারি? ইহাতে কি সংসারে সংসারী হইতে ইচ্ছা হয়? প্রতি রজনীতেই আমি এই ব্যাপার দর্শন করিয়া আসিতেছি। শ্যামা! তাঁহারা আমার পিতামাতা ভিন্ন অন্য নহেন। আজি তোমার কথায় আমার চৈতন্য হইল। শ্যামা! যাহার পিতা মাতা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী, তাহার আবার রাজ্যসুখ সম্ভোগ কেন? তাহার আবার বিলাস ব্যাপারে ইচ্ছা কেন? তাহার আবার দাস দাসী আত্মবন্ধু প্রভৃতি পরিবারবর্গের আবশ্যক কি? শ্যামা! আজি হইতে আমি সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিলাম। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিব। আমি অতি হতভাগ্য নরাধম সন্তান, পিতা মাতা আমাকে লাভ করিয়াই অপার দুঃখ-সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছেন। এ-ঘোর নারকীর মুখ দর্শন করিয়াই তাঁহারা অপার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আমার মরণই মঙ্গল। আমি বাল্যকাল হইতে পরমসুখে, পরম আনন্দে দিন যাপন করিয়া আসিতেছি। আর তাঁহারা অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। ইহাপেক্ষা মদীয় পক্ষে মহাপাপ আর কি আছে। মা! মা! মাগো! কোথায় আছেন, একবার এ-নরাধম সন্তানকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুন। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া মানব জন্ম সফল করি। একবার চন্দন-মিশ্র-কুসুম দামে, চরণযুগলের পূজা করিয়া পবিত্র হই। একবার মা! মা! শব্দে আহ্বান করিয়া হৃদয়জ্বালা নিবারণ করি। কি রণে, কি বনে, কি ভবনে, কি সম্পদে, কি বিপদে, সকল স্থানে, সকল সময়েই মা-শব্দ অতি মধুর শব্দ; মা-বাণী নিশ্চয়ই বিপদুদ্ধারিণী; মা-বোল নিশ্চয়ই বলপ্রদ; মা-আমার! মা! মাগো! আমি নয়ন-নীরে বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া পূর্ণস্বরে মা! মা! বলিয়া আহ্বান করিতেছি, দয়াময়ি! এ-দীনের প্রতি দয়া করিয়া প্রত্যুত্তর দানে আমায় শীতল করুন। পুত্র,

কুপুত্র হইলেও, মাতা কখন কুমাতা হয়েন না। জননি! একবার কু-পুত্রের প্রতি দয়া করিয়া দর্শনদানে জীবন দান করুন। পিতঃ! পরম ধার্ম্মিক দয়ার সাগর! এসময় আপনি কোথায়? আসিয়া অধম সন্তানের জীবন রক্ষা করুন। বলিতে বলিতে যুবরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। ক্রমে এই সংবাদ রাজান্তঃপুরে প্রচারিত হইলে নবীনকালী বেগে আগমন করিয়া কুমারকে অঙ্কে ধারণ করিলেন এবং নানাবিধ শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কুমার নবীনকালীর কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, মাতা নবীনকালী; নগেন্দ্র কহিলেন, মা! রক্ষাকারিণি জননি! জননী রত্নমালাকে কবে আমি আপনার পার্শ্বে দর্শন করিব? আমার এক পিতা স্বর্গস্থ; কিন্তু অন্য পিতা বনবাসী সন্ন্যাসী; কবে আমি তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব? নবীনকালী সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কহিলেন, বাপ নগেন্! রাজ্য, মন্ত্রী, বন্ধু, সেনাপতি এবং সৈন্যগণ থাকিতে চিন্তা কেন? উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া সকলের তাপিত জীবন শীতল কর। ধৈর্য্য ধর, অধৈর্য্য হইলে কার্য্য নষ্ট হয়। নগেন্দ্র, জননী নবীনকালীর প্রবোধ বাক্যে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া কর্ত্তব্য নিরূপণ নিমিত্ত বহির্দ্দেশে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রত্নমালা।

রত্নমালা, চন্দ্রচূড়ের হস্তবিমুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। বন হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত যতই চেষ্টা করিতে

লাগিলেন ভাগ্যদোষে ততই নিবিড় বনে পতিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে বহুদিন গত হইয়া গেল। ক্রমে জীবনে হতাশ হইলেন। সংসার অসার বোধ হইতে লাগিল। আশা ভরসা ক্রমেই অন্তর্হিত হইল। "এজন্মে আর আমি, স্বামী পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পাইব না" ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইলেন। তথাচ জীবনাশা সহসা ত্যাগ করা যায় না বলিয়াই অদূরে এক পর্ব্বতগুহা পাইয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দিনে দিনে শীর্ণ এবং বিবর্ণ হইতে লাগিলেন। বস্ত্রাভাবে বৃক্ষের বাকল পরিধান করিলেন। অন্নাভাবে ফল-মূল-পত্র মাত্র সার হইল। এক দিন তিনি গুহামধ্যে অবস্থান করিতেছেন এমন সময়ে, অদূরে মনুষ্য কলরব শ্রবণ করিয়া, বাহিরে আসিয়া কতকগুলি বিকটাকার বনচর মনুষ্যকে দর্শন করিলেন। মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। পুনর্ব্বার গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে লুক্কায়িত হইলেন। বন্যগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল এবং কথোপকথন করিতে করিতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে এক জন কহিল ভাই, এই স্থানে কোন মনুষ্য বাস করে। কারণ তাহার অনেক চিহ্ন দর্শন করা যাইতেছে। সকলে কহিল আমাদিগেরও তাহাই বোধ হয়। একবার অনুসন্ধান কর। সকলে সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে এক জন গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্ময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। দেখিল অন্ধকার গুহা আলো করিয়া এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনী সশঙ্ক অবস্থায় এক পার্শ্বে আসীন আছে। দেখিয়া সহচর সকলকে আহ্বান করিল। তাহারা পরমোৎসাহে আগমন করিয়া বলপূর্ব্বক রত্নমালাকে বহির্দ্দেশে আনয়ন করিল। সেই বনচরগণের সর্ব্ব প্রধান প্রভুর নাম ধনকেতু; সে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিল। বন্যগণ কহিল প্রভো! এ-কামিনী আপনার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রী; ভগবান্ আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই ইহাকে এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। চলুন গৃহে লইয়া যাই। ধনকেতু কহিল, তাহার আবার

অন্য কথা কি ; কে এই মনোমোহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সক্ষম হয় ? আজি আমাদের বন ভ্রমণ সফল হইল। কয়েক দিন যে আমার দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছিল তাহার ফল ফলিল। এই বলিয়া রত্নমালাকে গ্রহণ করিল। রাজরাণী এই ভয়ানক বিপদ সাগরে পতিত হইয়া হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিলেন। বহুবিধ বিনয় বাক্যে বন্যগণের আরাধনা করিলেন। ধনকেতুর চরণযুগলে পতিত হইয়া পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন কিন্তু সে সকল বৃথা হইল। ক্রমে রত্নমালা কাতর হইয়া জ্ঞান হারাইলেন। বন্যগণ সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে গৃহে লইয়া চলিল। ধনকেতু রত্নমালাকে গৃহে আনিয়া, প্রিয় পরিচারিণী সুলোচনার হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিয়া দিল, ইহাকে সাবধানে রাখিবে, যেন কোন রূপে পলায়ন করিতে না পারে। সুলোচনা রত্নমালার কালরাত্রি স্বরূপা হইয়া রক্ষা করিতে লাগিল। এই অসভ্য বন্যগণ আচার ব্যবহারে নিন্দনীয় হইলেও একটি সুনিয়ম কুলক্রমাগত ধর্ম্ম বলিয়া পালন করিয়া থাকে। তাহা এই, কোন কামিনীর সম্মতি ভিন্ন কখনই তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করে না। ছলে বলে কলে কৌশলে একবার সম্মতি সূচক বাক্য রমণীর মুখ হইতে বাহির করাইয়া পশ্চাৎ তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করে।

রত্নমালা কয়েক দিন বনবাসীর গৃহে অবস্থান করিলে পর, এক দিন ধনকেতু, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, সুন্দরি ! আর কেন মনোদুঃখে দিনযামিনী অতিবাহিত কর, আমার মনোমোহিনী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করাই তোমার কর্ত্তব্য ; যৌবন জোয়ারের জল, একবার বহিয়া গেলে আর আসিবে না। তুমি পরমসুন্দরী, পূর্ণ-যৌবন প্রযুক্ত শরীর শোভায় শোভাময়ী, যৌবনে পতি সঙ্গই পরম সুখ, কেন সে সুখে বঞ্চিত হইয়া দুর্ল্লভ মানব জন্ম বিফল কর। আমার সহবাসে তুমি পরম সুখে সময়াতিপাতে সমর্থ হইবে। আমি প্রাণ অপেক্ষাও তোমাকে অধিক ভাল বাসিব। সর্ব্বদা এই হৃদয়ে রাখিয়া

অনুগত হইয়া থাকিব। আমি বীরপুরুষ, মৃগয়ায় আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। যত হরিণ চর্ম্ম পরিধান করিতে চাও আনিয়া প্রদান করিব। আহারে হরিণ মাংস প্রচুর পরিমাণে পাইবে। আমার লক্ষ্মী অচলা। গৃহে কোন কষ্ট নাই। কথা রাখ, চরণে ধরি, এ-যৌবন বৃথা নষ্ট করিও না। রোদন পরিত্যাগ কর। সুন্দরি! আমায় পতিত্বে বরণ করিলে কি? রত্নমালা কহিলেন, বনবাসিন্! কঠোর বাক্যে আর আমায় দগ্ধ করিও না, ও-পাপ কথা আর মুখে আনিও না। আমি এক হংসকেতু ভিন্ন সকলকে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বলিয়া জানি এবং এ-চক্ষে সেই রূপই দর্শন করিয়া থাকি। তুমি আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া পাপপথ হইতে ধর্ম্ম পথে বিচরণ কর। ধনকেতু শুনিয়া দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। দুই এক দিন অন্তর এইরূপ ঘটনা ঘটিতে লাগিল। সুলোচনা বিস্তর প্রলোভন এবং বিস্তর ভয় দেখাইল, কিন্তু কোন ফলই ফলিল না। ধনকেতু রত্নমালার দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া ক্রমে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল এবং কহিল, তুমি যত দিন সম্মত না হইবে ততদিনই এইরূপ কষ্ট ভোগ করিবে। এই বলিয়া প্রহার করিয়া চলিয়া গেল। তদনন্তর সুলোচনা আসিয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিল। এইরূপে তথায় বহুদিন অতীত হইয়া গেল। এক দিন ধনকেতু কামবাণে অধীর হইয়া রত্নমালার নিকট আগমন পূর্ব্বক নিজ অভিলাষ সকাতরে জানাইল। চরণযুগলে পতিত হইয়া—ভিক্ষা চাহিল। রত্নমালা তাহাকে চরণ-দলিত করিয়া ভয়ানক ঝঙ্কারে কটু-বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তদ্দর্শনে ধনকেতু তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। রত্নমালা কহিলেন, বনচর! আর আমায় যন্ত্রণা প্রদান কর কেন? একেবারে বিনাশ কর। আমিও এ কঠোর যন্ত্রণা ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাই। তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে না। যদি তুমি আমায় শত সহস্র বৎসর গুরুতর কষ্ট প্রদান কর, যদি

পদাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুলি প্রমাণ অন্তর ছেদন কর, যদি জ্বলন্ত অনলে এ-অঙ্গ দগ্ধ কর, যদি পাদ প্রহারে এ-অঙ্গ বিচূর্ণিত কর, যদি তোমার সুতীক্ষ্ণ শায়কে এ-শরীর তিল তিল করিয়া বিদ্ধ কর, যদি করাল করবালে স্থানে স্থানে কর্ত্তন করিয়া লবণ সংযুক্ত কর, তথাচ তুমি আমাকে তোমার ভোগ্যা করিতে পারিবে না। এ-শরীর দেবগ্রাহ্য; যজ্ঞীয় হবি কখন কুক্কুরের ভক্ষ্য হয় না। ঘোর নারকী কখন স্বর্গীয় মন্দারকাননে স্থান পায় না। আমি মহারাজাধিরাজ হংসকেতুর মহিষী; সামান্যা নারীর ন্যায় ইন্দ্রিয় পরবশ নহি। আমার সতীত্ব,—মহারাজ হংসকেতুর আদরের ধন; আমি আবাল্য ইহাকে পরম যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। তুই কোন্ ছার্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণও আমার এ-সতীত্ব গ্রহণ করিতে পারগ নহেন। স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যকেও আমি তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া থাকি; আমার আরাধ্য দেবতা হংসকেতু; তৎসহবাস আমার স্বর্গীয় সুখ, তাঁহার পদ, আমার ব্রহ্মপদ, তাঁহার চরণ-রেণু আমার কৌস্তুভ-মণি, দুরাচার! তুই কোটী কোটী বৎসর তপস্যা করিলেও আমার চরণ ধূলার যোগ্য হইতে পারিবি না। ধনকেতু রত্নমালার বাক্যে নিরাশ হইয়া তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া ভূতলে শয়ন করাইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। এইরূপে তথায় রাজমহিষীর বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মহারাজ হংসকেতু।

সমরাবসানে নানাবিধ দুর্ঘটনা পরম্পরায় অভিভূত হইয়া হংসকেতু, সংসার পরিত্যাগ করিয়া যোদ্ধৃ বেশেই দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে

লাগিলেন। ক্রমে বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। নবীন-নীরদাবলি-পরম্পরায় গগন-মার্গ সমাচ্ছন্ন হইল। ঘোরতর গভীর গর্জ্জনে দিগ্‌ভাগ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্ষণ-প্রভা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ হইয়া রূপের ছটায় দশদিক আলোকিত করিতে লাগিল। বলাকাবলি নব-জলধর বক্ষে, যজ্ঞোপবীতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমে অবিরল জলধারা পতিত হইয়া ধরাতল প্লাবিত করিল। চাতক ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়া মনের উল্লাসে বারিধারা পান করিতে লাগিল। ভেকগণ মনের আনন্দে নূতন জলে সাঁতার দিতে লাগিল। হংস, বক, সারস প্রভৃতি পক্ষীগণের আনন্দের সীমা রহিল না। কদম্ব, কেতকী, দ্বিপাটী প্রভৃতি পুষ্প সকল প্রষ্ফুটিত হইয়া সদ্‌গন্ধে দিক্ সকল আমোদিত করিল। গৃহে গৃহে যুবক যুবতীগণ আনন্দ সলিলে অবগাহন করিল। বিরহিনীর নয়ন-নীর, বর্ষাবারিকে প্রবর্দ্ধিত করিল। খলের অন্তঃ-করণের ন্যায় আবিল আকাশ প্রদেশ সূর্য্যবদন আচ্ছাদন করিয়া দিন-যামিনীকে সমান করিল এবং জনগণের স্থানান্তর গমনাগমন রহিত করিয়া দিল। মহারাজ কোন রূপে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন। শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আকাশ প্রদেশ মেঘশূন্য হইয়া নির্ম্মল হইল। গ্রহনক্ষত্র সকল নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইল। আবিল সলিল পরিষ্কৃত হইল। কলহংস রবে দিগ্‌ভাগ মুখরিত হইতে লাগিল। শূন্যে শশধরের হাস্য, জলে নলিনীর হাস্য, স্থলে কুসুমের হাস্য, গৃহে যুবতীর হাস্য, বিবিধ হাস্যে ধরা হাস্যময়ী হইল। আপক্বশালি সকল অবনত মুখী হইয়া নববধূর ন্যায় মনোহারিণী হইল। পথের কর্দ্দম ক্রমেই বিশুষ্ক হইয়া গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দিল। জীবগণ প্রফুল্লভাব অবলম্বন করিল। যুবতীগণ বিবিধ বিলাস দ্রব্যে অঙ্গরাগ সম্পন্ন করিয়া রমণের মনোহারিণী হইল। মহারাজ হংসকেতু দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন বন মধ্যে মহেশ্বরের ভবনে সুরেন্দ্রের সহিত কথা বার্ত্তায় পরস্পরে

পরিচিত হইলেন। মহারাজ সুরেন্দ্রের নিকট স্বকীয় অবস্থার বিবরণ আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। সুরেন্দ্রও পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্রমে নিজ বিষয় কীর্ত্তন করিয়া কহিল, মহারাজ! এক্ষণে প্রার্থনা এই আমাকে পরদারগামী নারকী বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। আমি সে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। যোগী সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতেছি। রাজন্! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর পাপপথের পথিক হইব না। হংসকেতু কহিলেন, সুরেন্! তোমার বন্ধুপত্নী শৈলবালার চরিত্র কি এতই মন্দ হইয়া গিয়াছে? স্বর্গ-বাসিনী ইন্দুমতী কি এইরূপ হৃদয় বিদারিণী অবস্থায় প্রাণ হারাই-য়াছেন? কমলাকান্ত কি অদ্যাবধি সরোজবাসিনীর কোন অনুসন্ধান পান্ নাই? সুরেন্ কহিল, রাজন্! ইন্দুমতী ঐরূপেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সরোজের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে কিরূপ ঘটিয়াছে তাহা আমি জানি না। আর যে শৈলবালার স্বভাবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সে সেইরূপই বটে; মহারাজ! স্ত্রীজাতির চরিত্র, মানবের কথা দূরে থাকুক্ দেবতারাও অবগত নহেন। স্ত্রী জাতির ন্যায় মায়াবিনী জগতে দ্বিতীয় নাই। ইহাদের অসাধ্য কার্য্য আছে এরূপ বোধ হয় না। জগতে এমন পাপ নাই যাহা স্ত্রী জাতির শরীরে দৃষ্ট না হয়। লজ্জা ইহাদের নিকট লজ্জা পাইয়া পলায়ন করে। ইহারা বিশ্বাসের পরম শত্রু, অগ্রে তাহাকে হনন করিয়া পশ্চাৎ অন্য কর্ম্ম করে। শঠতা, ধূর্ত্ততা, প্রবঞ্চনা, মায়াকান্না, ইহাদিগের প্রিয়-সঙ্গিনী; ছল, বল, কল, কৌশল ইহাদিগের প্রিয় সহচর; ইহারা কাল ভুজঙ্গিনী অপেক্ষাও প্রতাপশালিনী; ব্যাধের বংশী রবের ন্যায় ইহাদের মধুর বাণী, মানব-হরিণের প্রাণ বিনাশে বিশেষ শক্তি সম্পন্ন; এই পাতকী জাতি, কিছুমাত্র সম্বন্ধ বিচার করে না। মুখে যাহাকে ঘৃণা করে, হৃদয়ে তাহাকে স্থান দেয়। কুসুমাঘাতে মূর্চ্ছিত হয়, কিন্তু উপপতির পাদুকা প্রহারেও কাতর নহে। ইহারা ছায়া

দেখিয়া ভয় পায় কিন্তু আশা পূরণে তমোময়ী যামিনীই প্রিয়সঙ্গিনী, ইহাদের মুখে মধু, অন্তরে বিষ; ইহারা বাহিরে সরলা, অন্তরে দারুণ কুটীলা; ইহারা স্বামী সমক্ষে পরম সতী, পরোক্ষে—পরম পরপ্রিয়া; অগতির গতি; দানে কর্ণের গর্ভধারিণী। সংসারে এমন বন্ধনী নাই, যে বন্ধনে ইহাদিগকে বদ্ধ রাখা যায়। ইহারা চাণক্য, বিসমার্ক প্রভৃতি চক্রী মন্ত্রীগণের শিক্ষাদাত্রী; ইহাদের নিকটে পুরুষের—সাহস তৃণবৎ অসার; বীরপুরুষে যে কার্য্য করিতে শঙ্কিত হয়, ইহারা সে কার্য্য কটাক্ষে সম্পন্ন করিয়া থাকে। ঘোর নারকী যে কার্য্যে ঘৃণা করে, সে কার্য্য ইহাদিগের চির অভ্যস্ত। ইহারা শতরণজিৎ (শতরঞ্জ) ক্রীড়ার বলের ন্যায় পুরুষগণকে চালনা করিয়া থাকে। পোষাপক্ষীর ন্যায়, যে বুলি শিক্ষা দেয় পুরুষে তাহাই বলে, যে কলু এবং গাড়োয়ান, বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া চালনা করে। ইহারা সেই তৈলিক এবং শকট চালককে নাসিকা বিদ্ধ বলদের ন্যায় চালনা করে। ইহাদিগের নিকটে সমস্ত মহারথীই তৈলিক শ্রেণীভুক্ত; যে ইহাদের বশীভূত, সে ঘোর মুর্খ; যে ইহাদিগকে বিশ্বাস করে, সে নির্ব্বোধ; যে ইহাদের মন্ত্রণা শ্রবণ করে সে অসার; স্ত্রী—যাহার দেবতা সে ঘোর নারকী; রমণীগণ স্বার্থ ভিন্ন কার্য্য করিতে জানে না। ইহারা আত্ম সুখোদ্দেশে সকল নরকই সমাদরে সঞ্চয় করিয়া থাকে। ইহাদের ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, বিবেচনা কিছুমাত্র নাই। সংসার ইহাদিগের ক্রীড়া ভূমি; ক্রীড়ার পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই। খাদ্যের দোষ গুণ কোন কালেই দর্শন করে না। অধিক কি এক কথায় বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় যে, পৃথিবীতে যত প্রকার পাপকার্য্য আছে তাহা এক দিকে এবং স্ত্রী জাতিকে এক দিকে রাখিয়া মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে, গুরুত্বে স্ত্রী জাতিই প্রধানা হয়। মহারাজ! আমি ইচ্ছা করিয়া শৈলবালাতে উপগত হই নাই। ধর্ম্ম সাক্ষী, সেই মায়াবিনীই মায়াজালে বিমুগ্ধ করিয়া আমাতে উপগত হইয়াছে। আমি তাহার অঙ্গ স্পর্শের পাতকী

নহি। হংসকেতু শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সকল স্ত্রী লোকই একরূপ নহে। ইহা বলিয়া নীরবে থাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নরপতি কহিলেন, সুরেন্! আমি অদ্যই এখান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিব, তুমি কি আমার সঙ্গি হইতে ইচ্ছা কর? সুরেন্ কহিলেন, আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না, এই বলিয়া মিত্র-মহেশ্বরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া যোদ্ধৃবেশে নরপতি সমভি-ব্যাহারে প্রস্থান করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবন—শৈলবালা।

শৈলবালা, শরচ্চন্দ্রকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া, উপপতির সহিত তাঁহার গৃহে গমন করিল বটে, কিন্তু তাহার মন কেমন এক প্রকার হইয়া গিয়াছিল। নিজের অবস্থা, শরতের অবস্থা, সুরেন্দ্রের কার্য্য, কালের গতি, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে এক প্রকার পাগলিনীর ন্যায় হইল। সুরেনের জীবন নাশ ভিন্ন আর অন্য পাপ সঞ্চয় করিব না বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া উপপতির আলয় হইতে প্রস্থান করিল এবং বৈষ্ণবীর বেশ ধারণ করিয়া প্রতি গ্রামে প্রতি নগরে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে শৈলবালা বৃন্দা-বনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃন্দাবনবাসী বালক বালিকাগণ, তাহাকে পাগলিনী বোধ করিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলিয়া অঙ্গে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কোন বালকা কহিল—

"ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ বল মন।
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এই এসেছি বৃন্দাবন ॥"

কোন বালক কহিল—

নারীকুলে দিয়ে কালি পতির মাথা খেয়ে।
এখন সন্ন্যাসিনী তপস্বিনী সাধের যৌবন যেয়ে ॥

অপর বালক কহিল—

গৌরচাঁদের লীলা খেলা বোঝা কিছু ভার।
বৈষ্ণবসনে মজা ক'রে বৈষ্ণবী যাবি ভবের পার ॥

অপরে গান ধরিল—

"যাস্‌নে বৈষ্ণবী আমায় ভাস্‌য়ে অকূল পাথারে।
আছি তোর পীরিতে বাঁধা না দেখ্‌লে প্রাণ
(বৈষ্ণবী না দেখ্‌লে প্রাণ) কেমন করে ॥
যখন জ্বালাতে জ্বলি, তখন্ তোরে কটু বলি,
দিয়ে প্রাণ প্রাণে কালি
যাস্‌নে ছেড়ে (বৈষ্ণবী যাস্‌নে ছেড়ে) তুই আমারে।
কি করি প্রেমের দায়ে, বরং তোমার ধরি পায়ে,
ফিরে চল ঘরে গিয়ে,
রাখ্‌বো তোরে (বৈষ্ণবী রাখ্‌বো তোরে) হৃদ্‌পিঞ্জরে ॥"

শৈলবালা কহিল বালক বালিকাগণ! আর কেন আমায় জ্বালাতন কর। ক্ষান্ত হও, অনেক হইয়াছে। এক্ষণে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন তোমাদিগের পবিত্র দেহ আমার ন্যায় পাপভারে ভারাক্রান্ত না হয়। কোন বালিকা কহিল, বৈষ্ণবী! তুই কি পাপ ক'রেছিস্ বল্ না।

শৈলবালা কহিল তবে শোন—

তোমার মত বালিকা কালে মিলি সকল খেলি।
মনের সাধে পথে পথে ধূলা খেলা খেলি॥
ছিল মন তখন ভাল ;
ছিল মন তখন ভাল, বিয়ে হ'ল এল যৌবন ক্রমে।
ভাতার বিনে, সময়গুণে প'ড়নু মহাভ্রমে॥
কেবল সঙ্গ দোষে,
কেবল সঙ্গ দোষে, জগতে ঘোষে, এ কলঙ্ক মোর।
নইলে পরে, কেন পরে, আমায় ব'লবে চোর॥
আবার তাহাও বলি
আবার তাহাও বলি, কমলকলি, উঠলো যখন বক্ষে,
কুলীন সখা, দেয় না দেখা, সদাই থাকি দুঃখে॥
সব কতই জ্বালা
সব কতই জ্বালা, তায় অবলা, বলাবল পতি।
তিনিই যখন, হ'লেন কৃপণ, আর কি থাকে জাতি॥

এক প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক শৈলবালার বক্তৃতা শুনিয়া হাসিয়া গান ধরিল—

"সই লো জ্বালাতন হ'লেম আগে তারে সঁপে প্রাণ মন।
কে জানে পীরিতে হবে বিচ্ছেদ ঘটন॥
সে শঠ লম্পট কঠিন কপট শঠতায় সঁপে মন।
সে-যে অবলা মজায়ে গেছে শেষে কলঙ্ক রটন॥"

শৈলবালাকে লইয়া এইরূপ আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে তথায় বহুলোক একত্রিত হইল এবং তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ কহিল, বৈষ্ণবী একটি গান গাও শুনি। শৈলবালা কহিল, কি গান গাইব? একটি টপ্পা গাও; না—

আমার পোড়া মনে ভাল লাগিবে না। তবে একটী মানভঞ্জন গাও। আমার সে সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। তবে একটি বিরহ গাও। ভাল ব'লেছ—কুলবালা! পবিত্রা! স্বামীর মরণ! উঃ বুকফেটে যায়! কিন্তু আমার ন্যায় পাপীয়সীর বুক ফাটে না, বিরহ! বিরহ! বিরহ! তবে শোন—

"দগ্ধ কপাল হ'ল ভঙ্গ; অধীনী জনে ত্যজিয়ে নাথ,
যায় দহিয়ে হৃদয় সভয় শুখাইল প্রেম রস রঙ্গ॥
সুখ-আশা পিপাসা, উহুঃ মরি সহচরি বৈধব্য দশা,
দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলে অঙ্গ। শশীমুখ ম্লান দেখে,
হৃদয় বিদরে দুখে, আর জ্বালা সয় না, ছার প্রাণ যায় না,
নীরবে রবে ব'লে কোন্ পথে কোথা গেলে,
প্রবল সুখ সিন্ধু-তরঙ্গ॥"

এ গান পরম সতীর—আমার ন্যায় হতভাগিনীর নহে।

এদিকে মহারাজ হংসকেতু সুরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বহুদিন নানা-স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন এক দিন সাংসারিক নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সুরেন্দ্রকে কহিলেন, সুরেন্দ্র! বল দেখি ধনের বিপদ কাহাকে বলা যায় এবং পৃথিবী মধ্যে কোন্ বুদ্ধিমান্ জাতি নিতান্ত অসার? সুরেন্দ্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, মহারাজ! বঙ্গদেশ ভ্রমণের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমাকে এ প্রশ্ন করিয়াছেন। নিবেদন করি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! তপস্যা ভিন্ন পুণ্য জন্মে না; পুণ্য না থাকিলে উচ্চপদে আরোহণ করা যায় না। যাঁহারা পুণ্যফলে উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতুল ধনের অধীশ্বর হয়েন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহারাই (তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই) আবার আত্ম বিস্মৃত হইয়া মন্দ কর্ম্মে ব্রতী হইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। ধনমদে মত্ত এবং

বিবিধ বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়া রাশি রাশি অর্থ ঘৃণিত কার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলেন। জীর্ণবস্ত্র পরিধৃত শীর্ণকায় ভিক্ষুকের কাতর বাক্য ধনীর কর্ণে প্রবেশ করে না। কিন্তু মদকল মদিরাক্ষী বারনারীগণের তীব্র-কটাক্ষ অনায়াসেই স্বকার্য্য সাধন করে। বিলাসী ধনীর ধনে; বিধবা রমণীর, পিতৃহীন বালকের, গরীয়সী জন্মভূমির, দুর্ভাগ্য সরস্বতী-পুত্রগণের, কোন উপকার হয় না। মহাত্মা তোষামোদকগণ, পূজ্যপাদ শুণ্ডী মহাশয়, পরোপকারিণী কুট্টিনী দেবী, সতী কন্যা গণিকা মহাশয়ারাই প্রকৃত অধিকারী এবং অধিকারিণী; যাত্রা, নাটকাদির অভিনয়, উপ-ঢৌকন, উৎকোচ, বন্ধু-ভোজ, প্রদেয় আলোক, বারুদের বাজী, ভ্রাম্যমাণ অশ্ব, এ সকলকেও ধনীর ধনের উত্তরাধিকারী মধ্যে গণ্য করা যায়। মহারাজ! আমি উল্লিখিত কার্য্যগুলিকেই ধনের বিপদ বা ধনীর ধনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ব্যাখ্যা করি।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বুদ্ধিমান্ জাতি বাঙ্গালী; ইহাদের এক এক জন, বৃহস্পতি সদৃশ; একথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। দান ধর্ম্ম প্রভৃতি সৎকর্ম্মে, পরিবার প্রতিপালনে ইহারা পৃথিবীর আদর্শ স্বরূপ, কিন্তু কতকগুলি গুরুতর দোষ নিবন্ধন সেই সমস্ত সদ্-গুণ, ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। বাঙ্গালী-দেহে একতা আছে এরূপ বোধ না। সাহস কাহাকে বলে বাঙ্গালী তাহা জানে না। লেখনী ইহাদের একমাত্র অস্ত্র; অঙ্গন-ভূমি সমরস্থল, বাগাড়ম্বর বীরদর্প; রমণীগণ দর্শকবৃন্দ; শয়ন-গৃহ অভেদ্য দুর্গ; পলায়ন প্রধান বল; দাসত্ব জীবনোপায়; পদলেহন স্বর্গ ভোগ; কাপুরুষত্ব প্রধান সহায় আর তিরস্কারকে পুরস্কার জ্ঞান করা বাঙ্গালীর মহদ্গুণ; লেখনী হস্তে করিলে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে,রসাতলে দিতে পারেন। বক্তৃতা আরম্ভ করিলে অঙ্গ-ভঙ্গি এবং তেজাদি দেখে কে? ছাগ-যুদ্ধের ন্যায়, বাঙ্গালীর আড়ম্বর দর্শন করিলে, অন্তঃকরণে কত অভি-নব ভাবের উদয় হয়। কিন্তু কার্য্যকালে সব ফাঁক্; সব নিষ্ফল;

ইহাদের মুখখানি আছে বলিয়াই অনেক সময় মান রক্ষা হয়। বুদ্ধি বিবেচনা আছে বলিয়াই মানব বলিয়া বোধ হয়। ইহারা বীরের সহিত যুদ্ধ বিষয়ে অপারগ হইলেও, রমণীর সহিত বাক্ যুদ্ধে বিশেষ দক্ষ; অস্ত্রাঘাত-সম্ভূত-শোণিত-দর্শনে হতচেতন হইলেও রমণী বধ-জনিত শোণিত দর্শনে অশেষ আনন্দিত হয়। মহারাজ! স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, বাঙ্গালী কোন কালে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে কি না। ইহারা বুদ্ধি সম্বন্ধে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করাইয়া থাকে, যদি সাহস বিষয়ে সেইরূপ হইত, তবে ধরাতলে রাজচক্রবর্ত্তীর সিংহাসন ইহাদের চির পদানত থাকিত। কিন্তু ভগবান্ চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায়, পদ্মে কন্টকের ন্যায়, সমুদ্রে লবণের ন্যায়, ময়ূরে কর্কশ স্বরের ন্যায় বাঙ্গালীতে ভীরুতা প্রদান করিয়া আপনার অদ্বিতীয় বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ! আমার মতে বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী জাতিই মনুষ্যের মধ্যে অসার; বাঙ্গালী যদি একবার খলতা পরিত্যাগ করিয়া সকল ভ্রাতায় একত্রিত হয়, তবে ইহারা সুর-কাননকেও পৃথিবীতে আনিতে পারে। সুমেরুর স্বর্ণশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া আনিয়া ক্রীড়া শৈল নির্ম্মাণ করিতে পারে। পৃথিবীতে ইন্দ্রের দ্বিতীয় সিংহাসনের ন্যায়, সিংহাসন স্থাপন করিতে পারে। পাদপীঠ স্বরূপ নক্ষত্র পুঞ্জে পুঞ্জে পাদবিক্ষেপ করিয়া সপ্ত-সর্গে বিচরণ করিতে পারে। শশধরকে পূর্ণাবস্থায় প্রতিদিন আলোক দানে নিযুক্ত রাখিতে পারে। অধিক কি সূর্য্যকেও কেন্দ্রভ্রষ্ট করিয়া নিজ তেজের পরিচয় প্রদান করিতে পারে। কিন্তু "সাত মন তেলও পুড়িবে না আর রাধাও নাচিবেন না"। দেবগৃহে চটকের ন্যায়, সৌধালয়ে চর্ম্ম চটিকার ন্যায়, কুহকণ্ঠীতে "অরণ্য বাস ধর্ম্মের" ন্যায়, বাঙ্গালী দেহে ভীরুতার বাস বিড়ম্বনা মধ্যে গণ্য; বাঙ্গালীর ভীরুতা-কলঙ্ক, কোন কালে অপনীত হইবে এরূপ বোধ হয় না। ইহারা ভীরুতাকে প্রিয়তমা জায়ার ন্যায় হৃদয়ে স্থানার্পণ করিয়া, না জানি কি সুখেই সময়াতিপাত করিতেছে। আর এক বিচিত্র কৌতুক এই

ইহারা গৃহস্থ হইয়াও উদাসীন ; অপরে ইহাদের সহস্র অনিষ্ট করিলেও তাহা দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলেও, এমনই শান্ত যে, শত্রুকে কথাটিমাত্র কহে না। বাক্য ব্যয় করিলে যে তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে! সুবুদ্ধি বাঙ্গালী কি তাহা বুঝিতে পারে না? পারে বৈ-কি!! রাজন্‌! বাঙ্গালি চরিত্রের আর এক মহদ্দোষ, বাঙ্গালা ভাষায় অনাদর,—ইহারা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে অভ্যাস করিয়া মাতৃ-ভাষায় দারুণ বিদ্বেষ্ট, এমন কি ভাই ভাই কথোপকথনেও ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত এবং কৃতার্থ বোধ করে। সময়ে সময়ে মাতা মহাশয়াও পুত্রের মুখে ইংরাজী প্রত্যুত্তর পাইয়া আপনাকে স্বর্ণগর্ভা মনে করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী ভ্রাতা; আজীবন রাশি রাশি ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিবে, তথাচ এক পংক্তি বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করিবে না। আপনারা কৃতবিদ্য হইলেও বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনে লেখনী ধারণ করিবে না। অপর, মাতৃ ভাষার উন্নতি কল্পে কেহ দুই একখানি পুস্তক বাহির করিয়া ইহাদের নয়নপথে উপস্থিত করিলে মুখভঙ্গি দেখে কে; সে ভঙ্গিতে শূকর কুক্কুরেরাও হারি মানিয়া থাকে। ওষ্ঠের মাংস কপোলে আসিয়া মুখ-বিবরের আয়তন দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত করে। নয়নযুগল,মারাত্মক বিষ-বর্ষণ করিয়া গ্রন্থখানিকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। চাঁদ-মুখ, ছাই মাথা হইয়া পশ্চাদ্ভাগে বাঁকিয়া যায়। গরলময়ী জিহ্বা অনর্গল দুর্ব্বাক্য-বিষবর্ষণ করিতে থাকে। দ্বেষ হিংসা ক্রোধে, বঙ্গ-ভায়াকে অস্থির করিয়া তুলে। নিকটে যিনি থাকেন, তিনি বঙ্গ-ভায়ার অবস্থা দর্শনে মনে করেন, এখানি গ্রন্থ না শমন! অথবা কালরাত্রি! ইহার দর্শনে বাবুর এরূপ অবস্থা ঘটিল কেন? গ্রন্থ দর্শনে বঙ্গভ্রাতা, এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে তাহাকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। হায়! এইরূপ অবিবেচক মহাপুরুষ-দিগের হস্তে বঙ্গভাষার দুরবস্থা দর্শনে হৃদয় বিমর্দ্দিত হয়। তবে সুখের

বিষয় এই এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য সদাশয়, পরোপকারী, বঙ্গ-ভাষা-প্রিয় মহাত্মা; মাতৃ ভাষার উন্নতি সাধনে লেখনী ধারণ করিয়া অরুচির রুচি সম্পাদনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। (অনেক পাঠকও মাতৃ-ভাষার গ্রন্থে, কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন।) যে সকল মহাত্মা ঈদৃশ সঙ্কল্পে ব্রতী; তাঁহাদিগের চরণে সহস্র প্রণাম।

হে ধরাধিপ! সম্প্রতি বাঙ্গালী চরিত্রে আর এক দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্বার্থপরতা; তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—রমণী; যে অভিভাবক মহাশয়, নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া, যাহার লালন পালন করেন, যাহার পীড়া হইলে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া রক্ষা করেন, যাহার বিদ্যা শিক্ষা জন্য অকাতরে, অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, পরে তাহার ব্যবহার নিতান্ত শোচনীয় হয় অর্থাৎ সেই যুবা শিক্ষিত হইয়া অর্থোপার্জ্জনে পারগ হইলে, ভাগ্য ক্রমে উন্নতপদে আরোহণ করিলে, আর তাহাকে পায় কে, তাহার ব্যবহারইবা দেখে কে, সে সেই—প্রতিপালককে একবারে ভুলিয়া যায়। সময় ক্রমে, তাহার শয্যাশায়িনী যুবতি সহধর্ম্মিণী প্রধান মন্ত্রিণী হইয়া উঠেন। তাঁহার আজ্ঞা ভিন্ন জলগণ্ডূষ গ্রহণ করা হয় না। এমন কি পরম পূজ্যা প্রিয়তমা স্ত্রী মহাশয়া অনুমতি না করিলে, হতভাগিনী গর্ভধারিণীও অন্ন বস্ত্র পাইবার অধিকারিণী হয়েন না। অভিভাবক মহাশয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া, স্ত্রীর মীমাংসায় স্থিরীকৃত হয়। তাঁহার সাহায্য করা দূরে থাকুক, মন্ত্রিণী মহাশয়ার আদেশে, তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়। তাঁহাকে নানাবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া প্রপীড়িত না করিলে, প্রতিরুদ্ধ স্বর্গ-পথ বিমুক্ত হইবে না বলিয়া নিশ্চয় করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ধন পিপাসা উপস্থিত হইয়া তাহাকে অশেষবিধ উৎপাতে পাতিত করে। ক্রমে অভিভাবক, আত্ম পরিবার এবং ভ্রাতৃগণ একত্রিত হইয়া ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। অকথ্য দুর্ব্বাক্য

সকল পরস্পরকে উপহার দিতেও কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। তৎপরে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া জয়লাভ প্রত্যাশায় নীচ প্রকৃতি সাক্ষীগণকে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক হস্তপদে ধারণ করিতেও কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ করে না। বহুদিন এইরূপ ঘোর সমর চালাইয়া শেষে গৃহ-লক্ষ্মীকে অর্দ্ধচন্দ্র দানে বিদায় দিয়া শান্তি লাভ করে। হতভাগিনী কমলা-দেবীও নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া ঘাড়ের বেদনা নিবারণ করত প্রতিজ্ঞা করেন আর এরূপ মূর্খগণের গৃহে গমন করিবেন না।

মহারাজ! বাঙ্গালী চরিত্রের আর এক দোষ দাসত্ব-প্রিয়তা; জীবিকা নির্ব্বাহের সহস্র পথ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকিলেও, ইহাদের চক্ষে তাহা পতিত হয় না। "বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দাসত্ব করিব" এই সংস্কার ইহাদিগের বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কিরূপে প্রভুর মনস্তুষ্টি করিতে হয়, কিরূপে প্রভুর কটুবাক্য সহ্য করিয়া সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে হয়, কিরূপে পাদুকাযুক্ত পাদ-প্রহার সহ্য করিয়া শরীর সুদৃঢ় করিতে হয়, কিরূপে প্রভুকার্য্য-জন্য গুরুতর পরিশ্রমে সুখাস্পদ—দেহকে রুগ্ন ও ভগ্ন করিতে হয়, কিরূপে প্রভুর পদ-লেহন করিয়া কুক্কুরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে হয়, তাহা ইহারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা করে। বঙ্গ-রমণীগণও দাসের স্ত্রী দাসী হইয়া সদ্‌গুণ সকলকে দেহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। অনেক বালিকাই দাসের স্ত্রী দাসী হইবার জন্য বাঞ্ছিত দেবতায় ফুলজলচন্দন দিয়া বর প্রার্থনা করে। যাহারা অনেক টাকা বেতনভোগী বড় দাসের স্ত্রী, তাহাদের অহঙ্কার দেখে কে? দেমাকে মাটীতে পা—ফেলে না। গরবে অঙ্গ ঢলঢল, অহঙ্কারে পৃথিবীকে "সরাখান" দেখে। আবার তাহাও বলি—দাসের স্ত্রী দাসীর অঙ্গে বারানসী শাটী, এক ঝুড়ি সোণার গহনা, দুই একখান হীরক উঠিলে, দাসীর আবার দুই চারিটি দাসী নিযুক্ত হইলে, সে—পৃথিবীতে পা—ফেলিবে কেন? সে দেবতাকে

ভক্তি করিবে কেন? সে গুরু লোকের মান্য রাখিবে কেন? সে অনাথ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে কেন? দাসীর শরীরে কোথায় সদ্‌গুণ সকল অবস্থান করে? যাঁহার স্বামী দাস নহেন তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর দুঃখের সীমা নাই। পদে পদে অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া ম্রিয়মাণা হয়েন, হইতেও পারেন; দাসী মহলে তিনি গৌরব লাভে বঞ্চিত। হা ধিক! এ সকল বঙ্গভূমির বিড়ম্বনা মাত্র।

মহারাজ! আর আমি গুণবান্ ভ্রাতাগণের কুচরিত্র কীর্ত্তন করিয়া কেন আপনার পাপরাশিকে বর্দ্ধিত করি; আমি মহাপাপী সুরেন্দ্র, আমা হইতে ভারতের যত অপকার হইয়াছে তাহার শতাংশেও উপকার হয় নাই। মহারাজ হংসকেতু কহিলেন, সুরেন্দ্র ক্ষান্ত হও, আর না, চল, অদ্য আমরা স্থানান্তরে গমন করি। এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং কিছুদিন পরে শৈলবালার আগমনের কয়েক দিন পূর্ব্বে, বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে দিন বালক বালিকাগণ শৈলবালাকে লইয়া রাজপথে জনতা উপস্থিত করিয়াছে। সেই দিন, মহারাজ সুরেন্দ্রকে লইয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই জনতা সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! সুরেন্দ্র ক্ষণকাল বৈষ্ণবীকে নিরীক্ষণ করিয়া হংসকেতুকে কহিল মহারাজ! "এই সেই শৈলবালা"; নৃপতি চকিত হইয়া কহিলেন "এই সেই শৈলবালা!!" হা জগদীশ! "পাপের ফল দুঃখ, ইহা আপনার অখণ্ডনীয় নিয়ম" আহা! হতভাগিনীর কি দশা বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে!! এইরূপ কহিতে কহিতে শৈলবালাকে দেখিতে লাগিলেন।

শৈলবালা সুরেন্দ্রকে দর্শনমাত্রেই চিনিয়া লইল এবং নিজ প্রতিজ্ঞা পূরণ মানসে একটি গান আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সুরেন্দ্রের নিকটে গমন করিল। সুরেন্দ্রের দেহ দৈবক্রমে বিশেষ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত ছিল না। চতুরা শৈলবালা, চকিতের ন্যায় বস্ত্র মধ্য হইতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া সবলে সুরেন্দ্রের উদর মধ্যে বসাইয়া

দিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া লইল এবং সেই রক্তাক্ত অস্ত্র নিজ বক্ষে আমূল প্রবেশ করাইয়া দিল। সুরেন্দ্র, পাপীয়সি! "আমি মারিলাম" বলিয়া ভূতলে পতিত হইল। শৈলবালা "এতদিনে আমার মরণে সুখোদয় হইল, হে ভগবন্! পাপিয়সী দুহিতাকে চরণে স্থানার্পন করিও" এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ভূপতি সুরেন্দ্রকে লইয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বাঁচাইতে পারিলেন না। সুরেন্দ্র সেই আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

নরপতি, ব্রাহ্মণ আনাইয়া সুরেন্দ্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পান্ন করাইলেন আর কহিলেন আমিই সুরেন্দ্রের মৃত্যুর কারণ; আমি স্ত্রী, পুত্র এবং ব্রহ্মহত্যাকারী দুরাচার, আমার তুল্য পাতকী জগতে অতি বিরল; এই বলিয়া নীরব হইলেন। কয়েক দিন মনোদুঃখে অতি বাহিত হইয়া গেল। তদনন্তর তথা হইতে যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সরোজ-বাসিনী।

সরোজবাসিনী বহুদিন বহুতীর্থে ভ্রমণ করিয়া কামাখ্যা দর্শনে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া হর-মনোমোহিনীর পাদপদ্মে ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সরোজবাসিনী চক্ষু-মুদিত করিয়া পরম পিতার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বহুক্ষণ এই ভাবে গেল। তদনন্তর গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন হে সর্ব্বসন্তাপহারিন্ পরম পিতঃ পরমেশ্বর! হে ভবার্ণব কর্ণধার! হে দীনদুহিতৃ-

বল্লভ! একবার করুণ-কটাক্ষ বিতরণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। দয়াময়! এক্ষণে আপনার দয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। দীননাথ! আমি আবাল্য পরম দুঃখিনী; আমার ন্যায় হতভাগিনী জগতে অতি বিরল; যিনি পতি, পরমগুরু, আমি যে গুরুকে অবলম্বন করিয়া সংসারে সুখিনী হইব মনে করিয়াছিলাম, সেই স্বামী আমায় চরণ-দলিত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। আশ্রয় প্রদানে বিমুখ হইয়া চির-দিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন, স্বামীর যে চরণ-সেবা করিয়া ভবার্ণবে পার হইব মনে করিয়াছিলাম, পতি আমায় সেই চরণ-তরণী প্রদানে বিমুখ হইলেন। যাঁহাকে জীবন যৌবন প্রদান করিয়া মনের মানস পূর্ণ করিব মনে করিয়াছিলাম, সেই স্বামী আমায় ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিলেন। আমাকে গর্ভে ধারণ করা জননীর কষ্টমাত্র সার হইল। আমাকে প্রতিপালন করা পিতার পরিশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। আমার বাঁচিয়া থাকায় ফল কি? হে দীনবন্ধো! এ-হত-ভাগিনীকে পৃথিবীতে পাঠাইবার কি আবশ্যক ছিল? আমাকে সৃজন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? আমি এমন কি মহাপাপ করিয়াছিলাম যদ্দ্বারা আমার এই অবস্থার সংঘটন হয়? হে পরমেশ্বর! আপনার পবিত্র নামের গুণে কত কত মহাপাপী উদ্ধার হইয়া গেল। আমার অদৃষ্টে কি সে ফল ফলিবে না? আর কেন, আমাকে বিনষ্ট করিয়া রক্ষা করুন। শ্রীপাদপদ্মে স্থানার্পণ করিয়া কৃতার্থ করুন। জগদীশ! করুণাময় পিতঃ! আপনি সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতিঃরূপ নির্গুণ, নিত্যানন্দ এবং এক; মূর্খেরাই আপনার মূর্ত্ত্যন্তর কল্পনা করে। অজ্ঞানেরাই আপনাকে আকার বিশিষ্ট করিয়া পূজা করতঃ পাপ সঞ্চয় করে। অসারেরাই আপনার প্রদত্ত বস্তু আপনাকে নৈবেদ্য স্বরূপে প্রদান করে। মূর্খতমেরাই আপনার সৃষ্ট ছাগাদিকে বলিরূপে উৎসর্গ করিয়া মুক্তির কামনা করিয়া নরক সঞ্চয় করে। এক ভক্তি ভিন্ন, এ অনন্ত বিশ্বে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা দিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট

করা যায়। পার্থিব যে বস্তু আপনাকে প্রদান করিব, তাহা আপনি অনেক দিন আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। হে নাথ! হে সর্ব্ব-সাক্ষিন্! হে দয়ার সাগর! হে সর্ব্বদর্শিন্! এ জ্ঞানহীনা অবলা আপনার মহিমার কিয়দংশ কীর্ত্তনেও শক্তি সম্পন্না নহে। আপনি বেদাদি সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রের অগোচর; আপনি অনন্ত; ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ আপনার মহিমা বর্ণনে অক্ষম; দয়া করিয়া একবার হৃদয় আসনে উপবেশন করুন। আমি ভক্তিরূপ নলিনীতে প্রেমরূপ চন্দন অঙ্কিত করত চরণযুগলে প্রদান করিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করি। দয়াময়! আর এক প্রার্থনা যেন আমায় বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। পরমপূজ্য স্বামী মহাশয় যেখানেই থাকুন, যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া পরম সুখে সময়াতিবাহিত করেন। যেন পাপবিমুক্ত হইয়া ধর্ম্মপথের পথিক হয়েন। স্বামী, স্ত্রী লোকের পরম দেবতা; পরম গতি; তিনি সুখে থাকিলেই আমি সুখিনী; আমার উপাসনা তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত; যত দিন আমার দেহে জীবন থাকিবে ততদিন আমি সেই চরণযুগলের উদ্দেশে পূজা করিব। আমার এ সতীত্ব তাঁহার প্রিয় বস্তু; জীবন পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছি। যদি কখন পরকালে সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁহাকে দেখাইব, তাঁহার প্রিয় বস্তু পবিত্রাবস্থায় আছে কি না। আমার এই লৌহ-নির্ম্মিত লৌহ, পতির প্রিয় সাক্ষী; ইহাকে আমি চুম্বন করি। এ-ও এক সময় সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আমায় সুখিনী করিবে। হে জগদীশ! হে জগৎপতে! আপনার চরণযুগলে আমার কোটী কোটী প্রণাম। এইরূপে উপাসনা সমাপন করিয়া পর দিন যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈবযোগে কিরাত রাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় শ্যামার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শ্যামা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সাদরে অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

সরোজবাসিনী কুশাসনে উপবিষ্ট হইলে শ্যামা সমস্ত ঘটনা সবিশেষ নিবেদন করিল। সরোজবাসিনী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং কহিলেন নগেন্‌কে আহ্বান কর। অল্পক্ষণ পরেই যুবরাজ শ্যামার আহ্বান ক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্যামা কহিল, মহাভাগ! ইনি আপনার জননীর সহোদরাধিক ভগিনী; সাক্ষাৎ-শরীরধারিণী শঙ্করী, আপনি ইহাকে প্রণাম করুন। যুবরাজ শ্রবণ করিয়া পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সরোজবাসিনী নগেন্দ্রকে উঠাইয়া শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। জানি না কি জন্য আজি তপস্বিনীর নয়নযুগলে জল আসিল। নগেন্দ্র রোদন করিতে করিতে আত্মবিবরণ নিবেদন করিলেন। সরোজবাসিনী নগেন্দ্রকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান কর। আমি আসিয়া তোমাকে তোমার পিতৃরাজ্যে লইয়া যাইব। এই বলিয়া বিদায় দিয়া শ্যামার সহিত কথোপকথনে সে দিন অতিবাহিত করিয়া পরদিন তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে নগেন্দ্র, শ্যামার মুখে সরোজের সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলেন।

পাঠক মহাশয়! আপনি এ পর্য্যন্ত শ্যামার বিষয় বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। শ্যামা ভদ্র কুলোদ্ভবা রমণী; অল্প বয়সে বিধবা হইয়া নিরাশ্রয় হওয়াতে রাজকুমারী রত্নমালা শ্যামার দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া আপনার নিকটে রাখেন। শ্যামা সেই হইতেই রাজ সংসারে অবস্থান করিতেছে। শ্যামা সামান্য পরিচারিণী নহে। অদৃষ্ট দোষে ঐ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে।

ওদিকে সরোজবাসিনী পথাতিক্রম করিতে করিতে কিছু দিন পরে পূর্ব্বোক্ত নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইয়া পথ ভ্রান্ত হওত বিপথে পতিত হইলেন। বেলাও অবসান হইয়া আসিল। সরোজবাসিনী কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। এমন সময়ে এক বনচর আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল মা! আপনার ন্যায় দেবীগণ আমাদের পরমারাধ্যা; আসুন আমার

গৃহে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করুন। সরোজবাসিনী তাহার সঙ্গে, তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। লোক পরম্পরায় বনচরের প্রতিবেশী এবং অধিপতি ধনকেতু, সন্ন্যাসিনীর সংবাদ পাইয়া প্রণাম জন্য তথায় আগমন করিল, এবং ক্ষণকাল মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ভবনে পদার্পণ জন্য ভিক্ষা জানাইল। সরোজ-বাসিনী তাহাকে কোন রূপে ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া তাহার সহিত তাহার ভবনে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পাদ ধৌত করিতেছেন এমন সময়ে ভিন্ন কুটীর হইতে, "হে ভগবন্! আমি রাজা-ধিরাজ হংসকেতুর সহধর্ম্মিণী হইয়া আর কত কাল এযন্ত্রণা সহ্য করিব আমায় বিনাশ করুন" এই কাতর বিলাপ শুনিতে পাইলেন। হস্ত হইতে জলপাত্র স্খলিত হইল। ধনকেতু তৎক্ষণাৎ পাত্রান্তরে জল আনিয়া দিল। প্রত্যুৎপন্নমতি সরোজবাসিনী হাস্যমুখে জলপাত্র গ্রহণ করত চরণ ধৌত করিয়া উপবেশন করিলেন। শাক্ত বনচরেরা ভক্তি-ভাবে প্রণাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া সরোজবাসিনীর আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিল।

এই ভাবে বহুক্ষণ গত হইয়া গেল। পরে সরোজবাসিনী কহিলেন। ধনকেতু! ঐ গৃহে স্ত্রী লোকের বিলাপ ধ্বনি শোনা যাইতেছে কেন? ইহার কারণ কি? ধনকেতু কহিল জননি! ঐ গৃহে একটী দুর্ব্বৃত্তা অবশীভূতা স্ত্রী লোক আছে। আমার অবাধ্য বলিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি। সরোজবাসিনী বিলাপ শ্রবণেই সমস্ত রহস্য অব-গত হইয়াছিলেন, কেবল স্বকার্য্য সাধন জন্য সমস্ত গোপন করিয়া কহিলেন, আমার আহার জন্য ফল মূলাদির উদ্যোগ কর। আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন হইলে কহিলেন, আলোক লইয়া আমার সঙ্গে আইস। এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, একবারে বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। রত্নমালা দর্শনমাত্রেই সরোজবাসিনীকে চিনিয়া লইলেন। স্বকরে সুধাকর পাইলেন। আনন্দে সপ্তস্বর্গে

বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া যেমন সরোজবাসিনীকে আহ্বান করিতে যাইবেন অমনি প্রত্যুৎপন্নমতি সরোজবাসিনী কহিলেন, প্রিয়তমে ভগিনি! এ-সন্ন্যাসিনী সরোজ-বাসিনী তোমার পরিচিত নহে। আমাকে আত্মবোধে কিছু বলিবে মনে করিতেছ, নিবৃত্ত হও, আমি তোমার কেহ নহি।

বুদ্ধিমতী রত্নমালা, সরোজের বাক্য ভঙ্গিতে সমস্ত বুঝিয়া লইলেন এবং কহিলেন, আপনি সন্ন্যাসিনী, আপনাকে আমার দুঃখ জানা-ইয়া কি প্রতীকার হইবে। তবে আপনার ন্যায় সন্ন্যাসিনীকে আমি বড় ভাল বাসী; আপনার এ-বেশ দেখিয়া আমি সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলাম, কিন্তু জানি না কি জন্য আমার চক্ষে জল আসিতেছে। আর আমি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারি না। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সরোজবাসিনী কহিলেন, ধনকেতু! স্ত্রী লোক বন্ধনদশায় থাকিলে আমার আহার হয় না। যদি বল ত ইহাঁর বন্ধন মোচন করি। ধনকেতু কহিলেন করুন। সরোজবাসিনী, বন্ধন খুলিয়া দিয়া, রত্নমালাকে বাহিরে আনিলেন। আপনি ভক্ষণ করিতে করিতে রত্নমালাকে ফলজল ভক্ষণ করাইলেন। ক্রমে কথাবার্ত্তায় রাত্রি অধিক হইলে, সরোজবাসিনী শয়ন করিলেন। ধনকেতুও রত্নমালাকে পূর্ব্ব-বৎ বন্ধন করিয়া রাখিল। রাত্রি প্রভাত হইলে সরোজবাসিনী বনচর-গণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সঙ্কেতে রত্নমালাকে কহিতে লাগিলেন। "বনদেবি! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করি, অতি শীঘ্রই তীর্থান্তর হইতে আগমন করিয়া এই পুত্রগণের সহিত আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। পুত্র বনচরগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করি-তেছি অতি শীঘ্র আসিয়া তোমাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব। এই বলিয়া যেমন গমন করিবেন, অমনি রত্নমালা কহিলেন, সন্ন্যা-সিনি! যে তীর্থে যাইবেন তথায় এ হতভাগিনীর দুঃখের কথা জানাই-বেন, বিস্মৃত হইবেন না। সরোজবাসিনী কহিলেন, দেবতারা আপনার

মঙ্গল করুন। এই বলিয়া গমন করিলেন। রত্নমালা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। এ-দিকে সন্ন্যাসিনী অন্যত্র গমন না করিয়া রত্নমালার উদ্ধার বাসনায় বনচর প্রদর্শিত কিরাতরাজ্য গমনের পথে নগেন্দ্রের নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন মধ্যেই রাজ ভবনে উপস্থিত হইয়া, নগেন্দ্রকে সমস্ত জানাইলেন। যুবরাজ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য সজ্জা করিয়া, সরোজের প্রদর্শিত পথে মাতৃচরণ-দর্শনে মনের আনন্দে আগমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রত্নমালা।

সরোজবাসিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কয়েক দিন পরে, ধনকেতু বন্ধুবান্ধব লইয়া, আমোদে উন্মত্ত হইল। বনজ মাদক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া হিতাহিত জ্ঞান হারাইল এবং এক একবার রত্নমালার নিকট আগমন করিয়া কহিতে লাগিল, আমার অদৃষ্টে যে দণ্ডই থাকুক, আজি আমি তোমার সতীত্ব নষ্ট করিব। রত্নমালা বিকটাকার বনচরের বিকট বেশ দর্শনে জ্ঞান হারাইলেন। চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বনবাসিরা রমণীগণসহ বিশেষ উন্মত্ত হইলে, এক বৃদ্ধা ভাবগতিক বুঝিয়া এবং রত্নমালার দীর্ঘকালীন কাতর বিলাপে ব্যথিত হৃদয় হইয়া, রত্নমালার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার বন্ধন মোচন করিলেন। তদনন্তর গুপ্তপথে রত্নমালাকে আনিয়া, কিরাতরাজ্যে পলায়নের পরামর্শ দিয়া তৎপথ দেখাইয়া দিলেন। রত্নমালা তৎপথাবলম্বনে ধাবমানা হইলেন। ক্রোশৈক গমনের পর, ধনকেতুর

পরিচিতা এক রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বনচরী কহিল, রত্নমালা তুমি কোথায় পলায়ন করিতেছ? রত্নমালা কহিলেন, পলাইব কেন আমায় ছাড়িয়া দিয়াছে। বনচরী কহিল একথা কখন না, আমি তোমাকে ছাড়িব না। প্রভুর নিকট লইয়া যাইব, এই বলিয়া হস্ত ধরিল, রত্নমালা হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন। উভয়ে টানাটানি যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বনচরী, রত্নমালার বলে না পারিয়া কহিল, এই আমি, প্রভুকে ডাকিয়া আনি, ইহা বলিয়া, গৃহাভিমুখে ধাবমানা হইল। রত্নমালা, প্রাণপণে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ক্লান্ত হইয়া, মনে মনে ভাবিলেন, আর আমার গমনের ক্ষমতা নাই এখনি বনচরেরা আসিয়া আবার রুদ্ধ করিবে। আর আমি এ-প্রাণ রাখিব না। এই ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতেছেন আর চতুর্দ্দিক্ দেখিতেছেন।

এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন অদূরে স্তূপাকার শুষ্ক কাষ্ঠ সঞ্চিত রহিয়াছে। দেখিয়া আনন্দের সীমা রহিল না। বহুকাল বনে থাকায়, অগ্নি প্রজ্বালনের কৌশল বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই অগ্নি জ্বালিয়া কাষ্ঠ রাশিতে প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে হুতাশন প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। রত্নমালা, গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং নয়নজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া কহিতে লাগিলেন—হে হুতাশন! হে সর্ব্বভুক্! আজি আপনি আমার অনন্ত দুঃখবিনাশী; আপনার এই রক্তবর্ণ মূর্ত্তি, আমার আনন্দদায়িনী; আপনার এই প্রবলশিখা আজি আমার প্রিয়সঙ্গিনী; আপনি আমাকে পবিত্র করুন। হে দেবগণ! হে সিদ্ধ-চারণ গন্ধর্ব্বগণ! আপনারা আমার প্রতি সদয় হউন। হে দীনজন পালক, সর্ব্বভূত-প্রিয়-পরমপিতঃ পরমেশ্বর! অন্তে এ-চিরানুগত দাসীকে, শ্রীপাদ-পদ্মে স্থানার্পণ করিবেন। এ-সময় আমার ভিক্ষা এই যেন প্রিয়পুত্র কুশলে থাকে। প্রিয়পতি হংসকেতুর যেন কোন কালে কোন অমঙ্গল না ঘটে। প্রভো! আমি বড় হতভাগিনী তাহা না

হইলে আমার এ অবস্থা ঘটিবে কেন? রাজমহিষী হইয়া কে কোথায় আমার ন্যায় দুঃখভাগিনী হইয়াছে? হে স্বামিন্! আপনি কি জীবিত আছেন? আসিয়া দর্শন করুন, আপনার রত্নমালা কিরূপে প্রাণত্যাগ করিতেছে। জীবিতনাথ! হৃদয়েশ! রত্নমালার জীবনসর্ব্বস্ব! এ-সময় কোথায় আছেন, আসিয়া একবার দর্শন দানে কৃতার্থ করুন। মনে বড় সাধ ছিল আপনার চরণ-যুগল দর্শন করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, কিন্তু তাহা ঘটিল না। মরিলেও আমার এ দুঃখ অন্তর্হিত হইবে না। নাথ! মদীয় মস্তকমণি! এজন্মে আর আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। যদি কখন পরকালে দেখা পাই মনের সমস্ত দুঃখ নিবে-দন করিয়া সুখিনী হইব। নাথ! আপনার উপভোগ্য এ-পবিত্র দেহকে পবিত্র রাখিবার নিমিত্ত, আজি প্রফুল্ল মনে হুতাশনে অর্পণ করিলাম। স্বামিন্! আপনার আদরের ধন—আমার সতীত্ব; তাহা কি আমি কলঙ্কিত করিতে পারি, তাহা বিশুদ্ধ অবস্থায় অগ্নিতে সমর্পণ করিলাম। মুরলে! একবার আসিয়া দর্শন কর, তোমার রত্নমালার কি অবস্থা ঘটিয়াছে। ভুবন-মোহিনি! সন্ন্যাসিনি সরোজ-বাসিনি! আর আমি তোমার মন-মোহিনী মূর্ত্তির দর্শন পাইব না। হে অগ্নি-দেব! এই আমার শেষ প্রণাম! এই আমার শেষ কৃতাঞ্জলি, এই আমার শেষ উপাসনা; হে স্বামিন্! একবার যাইবার সময়, পূর্ণস্বরে আপনার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া লই। প্রিয়তম হংসকেতু! জীবিতেশ হংসকেতু! রত্নমালার হৃদয়ভূষণ হংসকেতু! দাসী অগ্নি প্রবেশ করে, আসিয়া দর্শন করুন; এই বলিয়া ঝাঁপ দিবার নিমিত্ত যেমন বাহুবল্লী ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলিত করিলেন। অমনি সুমধুর পদাবলি শুনিতে পাইলেন "প্রিয়ে রত্নমালে!

হ'য়োনা হ'য়োনা প্রিয়ে! অনলে পতন।
এই তব চিরদাসে, কর দরশন॥

দুরাচার হংসকেতু, তোমার কষ্টের হেতু,
ক্ষমা করি অভাগারে ; রাখহ জীবন।
হ'য়োনা হ'য়োনা প্রিয়ে অনলে পতন ॥
দেশে দেশে বনে বনে ভ্রমি বহুদিন।
আজি কি পাইনু দেখা বদন-নলিন ॥
দারাপুত্র হারাইয়া, যায় হৃদি বিদরিয়া,
শূন্যময় দশদিক্ করি দরশন।
হ'য়োনা হ'য়োনা প্রিয়ে ! অনলে পতন ॥

এই কথাবলিতে বলিতে বেগে আগমন করিয়া প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। রত্নমালা অকস্মাৎ প্রিয়পতিকে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মহারাজ প্রিয়তমাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণের পর রত্নমালার চৈতন্যের উদয় হইল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখেন, প্রিয়পতি হংসকেতু ; দুই চক্ষে জল আসিল, নয়ন নিমীলিত করিলেন—পুনর্ব্বার চাহিয়া দেখেন, প্রিয়-পতি হংসকেতু ; তখন কাতর স্বরে কহিলেন, আপনি কোথা হইতে দাসীকে রক্ষা করিতে এখানে আগমন করিলেন ? হংসকেতু কহি-লেন প্রিয়ে ! বহুদেশ ভ্রমণের পর, কামাখ্যা দর্শনে যাইতেছিলাম, বন মধ্যে পতিত হইয়া ঘটনা ক্রমে এই স্থানে আসিয়াছি। আসিয়া দেখি, তুমি পুনঃ পুনঃ আমার নামোচ্চারণ করিয়া অনলে প্রবেশ করিতেছ। হায় ! আর ক্ষণবিলম্ব হইলে আমি তোমাকে এ-জন্মের মত হারাইয়াছিলাম। তোমার এ অবস্থার কারণ কি ? এক্ষণে তাহা বলিয়া, আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। রত্নমালা সমস্ত নিবে-দন করিয়া কহিল, মহারাজ ! বনবাসী দস্যুগণ আগত প্রায়, চলুন আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। উভয়ে গমন করিবার জন্য যেমন উত্থিত হইলেন। অমনি অদূরে কয়েক জন বনচরকে দেখিতে পাইলেন। রত্নমালা কহিলেন স্বামিন্ ! ঐ সেই বনচর দুরাচার

ধনকেতু আসিতেছে। আমরা আবার বিপদে পতিত হইলাম। হংস-কেতু কহিলেন প্রিয়ে! তুমি আমার পশ্চাতে থাক, আজি সাক্ষাৎ শমন আসিলেও আমার হস্তে নিষ্কৃতি পাইবে না। এই কথা বলিতে না বলিতে বনচরেরা আসিয়া রত্নমালার নিমিত্ত বিবাদ আরম্ভ করিল। ক্রমে ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধনকেতু কহিল, আমার সহচর-গণের মধ্যে এক জন সত্বর গমন করিয়া, আমার সমস্ত দলবলকে সংবাদ দাও! তাহারা যেন ত্বরায় আগমন করে। বনচর সংবাদ দানে ধাবমান হইল। মহারাজ হংসকেতু, একে একে প্রায় ধনকেতুর সমস্ত সহচরকে বিনষ্ট করিলেন। কিন্তু স্বয়ং ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ বহুসংখ্যক বনচরও আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ধনকেতু কহিল, দুরাচার আর তোর্ রক্ষা নাই। নর-পতি কহিলেন, আমি জীবিত থাকিতে তোরা নিরাপদ হইতে পারিবি না। আয়্ আজি হস্তবল প্রদর্শন করিয়া জীবন সার্থক করি। রত্ন-মালা কহিলেন স্বামিন্! অনুমতি করুন আমি এই প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত বিপদ নিবারণ করি; দাসীর জন্য কেন জীবন হারাইবেন। হংসকেতু কহিলেন প্রিয়ে! আমার অন্তে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিও।

মহারণ্যে ঘোর সমর বাধিয়া গেল। মহারাজও ক্রমশঃ বলহীন হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে মহারাজের পশ্চাদ্ভাগে অসংখ্য সৈন্যের কলরব শ্রুত হইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে অরণ্য, জোকারণ্য হইয়া গেল। সরোজবাসিনী দূর হইতে রত্নমালা এবং হংসকেতুকে দেখিতে পাইয়া, আনন্দ সমুদ্রে ভাসমান হইলেন। তদনন্তর নগেন্দ্রকে কহিলেন, নগেন্ তোমার সৈন্যগণকে শীঘ্র এই বনচরদিগকে আক্রমণ করিতে বল। বনচরেরা, বহুল সৈন্য দর্শনে পলায়ন করিল এবং কয়েক জন জীবনও হারাইল। সরোজবাসিনী দ্রুত-পদে গমন করিয়া রত্নমালাকে আলিঙ্গন দিলেন। রত্নমালা, প্রিয়তমে

ভগিনি সরোজবাসিনি! মরি! মরি! আজি আমার কি শুভ দিন, এই বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সরোজবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্র আগমন করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। ইত্যবসরে সরোজবাসিনী কহিলেন, বাপ নগেন্! যোদ্ধৃবেশে অলঙ্কৃত পরম ধার্ম্মিক দয়ার সাগর এই মহারাজ হংসকেতু তোমার পিতা; সাবিত্রী সদৃশী পতি-ব্রতা দয়াময়ী এই রত্নমালা তোমার জননী; ভক্তিভাবে প্রণাম কর। নগেন্দ্র শ্রবণমাত্র পিতার চরণতলে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

পিতঃ এ-হতভাগ্য সন্তান পুনর্ব্বার যে এই চরণ যুগলের দর্শন পাইবে, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। আমি ঘোর পাপী তাহা না হইলে চরণ হইতে বিচ্যুত হইব কেন? ঘোর নারকীর মস্তকে অভয় চরণ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। তদনন্তর মাতৃ-চরণে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন জননি! আপনার হতভাগ্য-সন্তান নগেন্দ্র, আর বার যে এই মুক্তি-প্রদ-চরণ-যুগলের দর্শন পাইবে, সে আশা এক-বারও করে নাই। এই চরণ আমার আরাধ্য বস্তু, এই চরণ আমার নির্ব্বাণ মোক্ষপ্রদ, এই চরণ আমার অক্ষয় স্বর্গ; এই চরণ আমার যাগযজ্ঞ এবং তপস্যার ফল; মা! মা! মাগো! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমার এমন আরাধ্য বস্তু কিছুই নাই, যাহা আপনার এই শ্রীপাদ-পদ্মকে অতিক্রম করিতে পারে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ; এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাত্মক সাক্ষাৎ ঈশ্বরও এই চরণ যুগল অপেক্ষা অধিক পূজ্য নহেন। এই চরণ আমার ভবসমুদ্রের তরণী, গাঢ় তিমিরের দীপশিখা এবং সংসার সঙ্কটের একমাত্র ত্রাণোপায়। জননি! ব্রহ্মময়ি! মোক্ষপ্রদে! একবার নরাধম সন্তানের মস্তকে চরণ-দ্বয় প্রদান করুন। চরণ স্পর্শে দেহ পবিত্র হউক। পবিত্র ধূলি সংযোগে দুরাচারের অমস্ত অনন্ত দুষ্কৃতির ক্ষয় হউক। মা! একবার মন ভরিয়া মা বলিয়া ডাকি। মা! মা! মাগো! একবার উত্তর দানে দেহ প্রাণ শীতল করুন।

রত্নমালার আনন্দাশ্রুর আর কে সম্বরণ করে। পূর্ণস্বরে কহিলেন নগেন্দ্র! আমার নগেন্দ্র! প্রিয়-পুত্র নগেন্দ্র! অন্ধের যষ্টি; নয়নমণি, কণ্ঠের হার, হৃদয়-ভূষণ নগেন্দ্র! আমি, তোমাকে কি কোলে পাইলাম? এস! বাপ আমার এস! চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া, মনের দুঃখ নিবারণ করি; পুত্র! পুত্র! পুত্র নগেন্দ্র! তুমি কি আমায় মায়াবিনী নিদ্রায় প্রতারিত করিতেছ? না আমি সত্য সত্যই তোমাকে হৃদয়ে পাইলাম? এস বাপ এস! বক্ষে ধারণ করিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করি, এই বলিয়া কোলে লইলেন। কপালফলকে কত শতবার চুম্ব দিলেন। হংস-কেতু, প্রিয়তমার বক্ষ হইতে পুত্রকে নিজবক্ষে ধারণ করিলেন। বন-মধ্যে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। ঘন ঘন তোপ-ধ্বনি হইতে লাগিল। এই অবসরে কয়েক জন অশ্বারোহী ধনকেতুকে বদ্ধ করিয়া আনিল। রত্নমালা তাহাকে, অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে কহিলেন। কিন্তু নগেন্দ্র পিতৃ বক্ষঃ হইতে অবতরণ করিয়া দস্যু হস্তে অস্ত্র দিয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে সকলে মহাসমা-রোহে কিরাতরাজ্যে গমন করিয়া শ্যামার সহিত মিলিত হইলেন এবং নবীনকালীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। বিজয়পুর এবং ধারারাজ্যে এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। পরে মহারাজ হংসকেতু; নবীনকালীকে, প্রিয়তমার সঙ্গিনী করিয়া, পূজ্যতমা সরোজ-বাসিনীর সহিত চন্দ্রচূড়ের বিচার জন্য তথায় গমন করিলেন। বিচারে তাহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইল। কিন্তু নগবালার প্রার্থনা মতে রত্নমালা চন্দ্রচূড়ের জীবন রক্ষা করিয়া, তাহার রাজ্যে তাহাকে স্থাপিত করিলেন। চন্দ্রচূড় অনুগত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিল। ক্রমে হংসকেতু দারা পুত্র সম্বন্ধে বনচরদিগের অদ্ভুত রহস্য অবগত হইলেন।

এদিকে সেনাপতি প্রতাপসিংহ এবং মহারাজ বিনয় এই শুভসংবাদে আনন্দিত হইয়া বন-রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এবার মুরলা সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বিধিবশে আবার রত্নমালা, মুরলা এবং

সরোজ-বাসিনী, তিন জনে একত্রিত হইলেন। সুখের সীমা নাই। তাহার উপর আবার যুবরাজ নগেন্দ্রের প্রগাঢ় ভক্তি তাঁহাদিগের সেই সুখ-সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। কয়েক দিন সকলে বনবিভাগে থাকিয়া পরে ধারারাজ্যে উপনীত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। আরবার মহারাজ সিংহাসনে আসীন হইয়া মনের সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

কথোপকথন।

এক দিন বৈকালে নবীনকালী এবং রত্নমালা একাসনে আসীন হইয়া, পরস্পরে কথোপকথন করিতেছেন, সম্মুখে কুশাসনে সরোজ-বাসিনী উপবিষ্ট হইয়া নীরবে রত্নমালার বনবাস-কষ্ট-কথা শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় মুরলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, রত্নমালা রোদন করিতেছেন। আয়তনয়নে অজস্র-অশ্রুজল বিগলিত হইয়া বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছে, দেখিয়া কহিলেন, মান্যে সরোজবাসিনি! রত্নমালা রোদন করিতেছেন কেন? আপনি উপস্থিত থাকিতে রত্নমালার চক্ষে জল কেন? তখন সরোজবাসিনী কহিলেন, ভগিনি রত্নমালে! ক্ষান্ত হও, আর রোদন করিও না। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলের অবস্থা সকল সময় সমভাবে থাকে না। অদৃষ্টায়ত্বকাল-স্রোতঃবচ্চঞ্চল, ইহার গতি, চক্রনেমীগতিবৎ পরি-বর্ত্তনশীল, এক অবস্থায় থাকে না। জীবগণ সময়ধর্ম্মে সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। যদি জগতে দুঃখ না থাকিত, তবে সুখ যে কি পদার্থ তাহা লোকে অবগত হইত না। অন্ধকার আলোকের মহিমা প্রকাশ করে। বিপদ ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অভাব পরোপকারে

শিক্ষা দেয়। যন্ত্রণা পরদুঃখ নিবারণার্থ উপদেশ দেয় এবং কষ্ট, দয়া প্রবৃত্তিকে সঙ্গিনী করিয়া দেয়। ভগিনি রত্নমালে! ঈশ্বর কষ্টাদি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সকল আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত; যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বিশুদ্ধতা দর্শন করে, তেমনই ঈশ্বর কর্ম্মদোষে আমাদিগকে অশেষ উৎপাতে পাতিত করিয়া পরীক্ষা করিয়া লন। যখন দেখেন কিছুতেই ধর্ম্মপথ-ভ্রষ্ট হইলাম না তখন আনন্দে অঙ্কে ধারণ করিয়া সাদরে মুখচুম্বন করেন। তুমি যখন উৎকট বিপদে পতিত হইয়াও ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ কর নাই, তখন বিশ্বনাথ, তোমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট; আর না, রোদনে ক্ষান্ত হও। পরিহাস প্রিয়া মুরলা কহিলেন—

প্রাণ-স্বজনী বিনোদিনী রোদন সম্বর।
(এখন) বেলা গেল সন্ধ্যে হ'ল শোবার যোগাড় কর॥

এই কথা বলিতে বলিতে সহাস্য আস্যে গমন করিয়া অঞ্চল দ্বারা রত্নমালার মুখ মুছাইয়া সবলে চুম্বন করিলেন। নবীনকালী দেখিয়া শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। মোক্ষ পথাবলম্বিনী সরোজবাসিনীর অধরেও আজি ঈষৎ হাসি দেখা দিল। মুরলা কহিলেন রত্নমালে! নববিকশিত নলিনীর ন্যায় সুবাসিত আননে আনন অর্পণ করিয়া আমার তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল যদি কিছু না বল ত আর একবার চুম্বন করি। নবীনকালী কহিলেন, পরের ধনে লোভ কেন? মুরলা বলিলেন, যদি ঠাকুর ঝি ইহাতে ক্ষতি বোধ করে, তবে ধার্ দেক্ পরে শোধ লইবে। নবীনকালী কহিলেন, যদি তোমার ঠাকুর জামাই ধার আদায় কত্তে-চান? মুরলা বলিলেন, তখন তোমাকে দেখাইয়া দেবো। রত্নমালা মুরলার চতুরতায় সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া কহিলেন, অয়ি মুরলে! একের ঋণ অন্যে শুধিবে কেন? মুরলা বলিলেন ইহা যদি জান, তবে ঠাকুর জামাই আমায় ধরিবেন কেন? রত্নমালা

কহিলেন, আমি যে তাঁহার ; মুরলা কহিলেন, হাঁ আমি তোমার, বিনয় আমার, তবে বিনয়ও আমার মত তোমার ? রত্নমালা কহিলেন, বিনয় আমার ভাই। মুরলা বলিলেন, আমিও বলি তাই, বিনয় তোমার ননদের ভাই।

অয়ি রত্নমালে ! অবলে সরলে,
আমার বচন ধর লো।
তুষিতে রমণে, বসন ভূষণে,
রমণীয় বেশ কর লো ॥
হারায়ে রমণে, ভ্রমি বনে বনে,
যাতনা পেয়েছ যত লো।
এবে ওলো সতি ! লয়ে প্রাণপতি,
সুখভোগ কর তত লো।
বহু দিনান্তরে, পতি এলে ঘরে,
সতীর আনন্দ বড় লো ॥
সে মিলনে হয়,— কি যে সুখোদয়,
জানে সে রমণী বড় লো।
আমার মতন, যাহার রতন,
পাছু পাছু সদা রয় লো ॥
সে জন কখন, না জানে রমণ,
কেমন আরাধ্য হয় লো ॥
পতি সোহাগিনী, সরোজবাসিনী,
পতি-ভক্তি জানে ভাল লো।
পতি প্রেমাধীনী, হ'য়ে সন্ন্যাসিনী,
জগত ক'রেছে আলো লো ॥

রত্নমালা কহিলেন মুরলে! তুমি এতক্ষণে আমার অন্তঃকরণের কথা বাহির করিয়াছ। ভগিনী সরোজবাসিনীর সন্ন্যাসিনীর অবস্থা আমাকে নিতান্তই ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। আহা! স্বর্ণ প্রতিমার মুখ পানে চাহিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যদিও সম্প্রতি, দৈব শক্তিতে ভগিনী আমার শক্তিময়ী হইয়া কৈলাসবাসিনী ভবানী দেবীর ন্যায় মূর্ত্তিমতী হওত সরোজবাসিনী রূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। (অদৃশ্য হইলেও) যদিও দেখিতে পাইতেছি যেন পশুপতি, ত্রিশূল হস্তে ভগিনীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তথাচ হৃদয় ফাটিয়া যায় এই কথা বলিতে বলিতে সত্বর উত্থিত হইয়া সরোজ-বাসিনীর চরণ যুগল ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাভাগে! বৃদ্ধ পিতার মুখ চাহিয়া, জননীর নেত্র-নীর স্মরণ করিয়া, আমার প্রতি দয়া করিয়া, মুরলার অনুরোধ রাখিয়া, প্রিয়পতি কমলাকান্তের অপরাধ ক্ষমা করিয়া, গৃহ বাসিনী হও; আমি নারায়ণের বামে লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। আমি মুরলার মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়াছি, কমল এখন সৎপথাবলম্বী হইয়াছেন। তোমার অভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন। "প্রিয়ে! সরোজ! প্রিয়তমে সরোজ!" বলিয়া দিন যামিনী রোদন করিতেছেন। মানিনি! অভিমান ত্যাগ করিয়া পতির প্রতি সদয় হও। আমি তোমার সহোদরাধিক জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আমার মাথা খাও, কথা রাখ; তোমার কান্তের জীবনান্ত হয়, রক্ষা কর। ব্রহ্মবধ মহাপাপ, তাহাতে আবার স্বামী, পরম-গুরু; গুরুবধ করিও না। সরোজ!

"দুরাচার পতি যদি গুরু দোষ করে।
সতী নারী তাহে কভু দোষ নাহি ধরে॥
সুরূপ কুরূপ কিম্বা আময় সংযুত।
হ'লে পতি, তাহে সতী নহে ভক্তিচ্যুত॥

সতী থাকে একভাবে এখন যেমন।
যখন যেমন দশা তখন তেমন ॥
সতী না সহিতে পারে পতির দুর্দ্দশা।
নিদাঘ হইলে শেষ থাকে না বরষা ॥

মুরলা কহিলেন, মান্যে সরোজবাসিনি! এক্ষণে আপনি আর আমাদের সঙ্গিনী সরোজবাসিনী নহ। রসালাপে আর আমাদের মনোহারিণী নহ। এক্ষণে আপনাকে তুমি বলিতে ভয় করে। চরণ-ছুঁইতে শঙ্কা বোধ হয়, পবিত্র অঙ্গে হস্ত দিয়া সেবা করিতেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। আপনি এখন মূর্ত্তিমতী তপস্যা; মানিনি! মুরলা এই চরণে ধরিয়া বিনয় করিতেছে পতির অঙ্কবাসিনী হও। তোমার পরিহাস প্রিয়া মুরলাকে একবার কমলের কমলা হইয়া পরিহাসে হাসাও। মানিনি! আর তুমি অভিমানে থাকিও না। সরোজ! এ সুবাসিত স্বর্ণ-পদ্মের দুর্লভ মধু; একবার মধুকরকে দিয়া পরস্পরে কৃতার্থ হও। কৃপণের ন্যায় কৃপণা হইয়া কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিও না। একবার এই মদন-শরাসন-বিনিন্দি-ভ্রূযুগলে কটাক্ষ-শর সন্ধান করিয়া স্বামীর মন-মৃগ বিদ্ধকর। তুমি মুরলাকে চিরদিন স্পর্দ্ধা প্রদান করিয়া থাক। আজি মুরলা তোমায় ছাড়িবে না, সে এই ভস্মাচ্ছাদিত কেশে আজি বেণী বাঁধিবে; রুদ্রাক্ষের মালার পরিবর্ত্তে আবার হীরক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবে। কুশ-মেখলা ছিন্ন করিয়া আবার স্বর্ণ-মেখলা পরাইবে, আবার এই রাঙ্গা চরণে স্বর্ণ-নুপুর পরাইয়া নয়নযুগল সার্থক করিবে, ভস্মাচ্ছাদিত কুচযুগলে আবার চন্দনাদি অঙ্কিত করিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করিবে, আবার তোমাকে স্বর্ণপালঙ্কে শোয়াইয়া তোমার হৃদয়-মাঝে তোমার প্রাণকান্ত কমলাকান্তকে দেখিয়া, সকল দুঃখ বিস্মৃত হইবে। সরোজ! সরলে! তোমার পতি—

"দারত্যাগী দুরাচার নরাধম শিরে,
পড়ুক সহস্র বজ্র গভীর গর্জ্জনে।
শত খণ্ড করে দেক্ এ-পাপ শরীরে,
এড়াই হৃদয় জ্বালা সুখের মরণে॥"

এই বলিয়া যখন চৈতন্য হারাইয়াছিলেন তখন আমাতে আর আমি থাকি নাই। আরবার তোমার অভাবে তাঁহার ব্রহ্মচারীর বেশ দর্শন করিয়া মৃতবৎ হইয়াছি। দয়াময়ি! পতি প্রতি চাও, দয়া কর। মুরলার এই বাক্যে সরোজবাসিনীর চক্ষে জল আসিল। নীরবে রোদন করিয়া সকলকে কাঁদাইলেন। পরে পতির শেষ পত্র খানি রত্নমালা এবং মুরলাকে দেখাইয়া কহিলেন, আমার সুখ এজন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে। তবে জানি না কি জন্য আবার, এজন্মের মত, আর একবার, কেবল চক্ষের দেখা দেখিতে, সেই চরণ যুগল, চক্ষের দেখা দেখিতে ইচ্ছা হইল। জানি না কিজন্য এজন্মের মত আর একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। মুরলা স্ত্রীজন সুলভ অসাবধানতায় রত্নমালার গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আমরা কমলকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছি। তোমার দাদা বিনয় তোমার জন্য বড় কাতর, তিনিও কমলকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছেন। সরোজ শুনিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন প্রকাশ্যে আর তাঁহার চরণ দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। গুপ্তভাবে সেই আরাধ্য চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। তিনি আমার প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, সর্ব্ব সমক্ষে পুনর্ব্বার সেরূপ করিলে, আমাতে আর আমি থাকিব না। অতঃপর এস্থান হইতে প্রস্থান করাই উচিত। এই ভাবিয়া নীরবে থাকিলেন। পরে কৌশল ক্রমে তথা হইতে যে কোথায় প্রস্থান করিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কমলাকান্ত।

সরোজবাসিনীর বিরহে কমলাকান্ত এক প্রকার পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন। কখন্ কোথায় থাকিতেন, কোথায় গমন করিতেন তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। এইরূপে দুই বৎসর গত হইলে এক দিন তিনি বিষদাতা বিপিনের বাসস্থানের নিকট দিয়া গমন করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা তাঁহাকে কাতরস্বরে আহ্বান করি-লেন। কমলাকান্ত নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন কমল! একবার আমার সঙ্গে আমার বাটীতে আগমন কর। এই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে কমলাকান্তকে বসিতে আসন দিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, বাপ কমল! আমি বিপিনের জননী; বিপিন আমার একমাত্র পুত্র; আমার দুরাত্মা পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তোমাকে বিষ-ভক্ষণ করাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে সত্য, কিন্তু বাপ! মায়ের প্রাণে তাহা সহ্য হয় না। আমি বিপিনের অভাবে চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় নিরী-ক্ষণ করিতেছি। আমার শয়ন ভোজনে সুখ নাই। শোক দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছি। এ-পাপজীবন ওষ্ঠাগত হইয়াও যে কেন বহির্গত হইতেছে না তাহা আমি জানি না। বাপ! তুমি ধার্ম্মিক, পরোপ-কারী, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্,—তুমিই যখন অপথে পদার্পণ করিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছ, তখন আমার অল্প বুদ্ধি পুত্র যে অপথে পদার্পণ করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? কমল! তুমি পতিব্রতা সরোজবাসিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাদৃশ কষ্ট ভোগ করিতেছ, আমি বিপিনের অভাবে

তাদৃশ বা তদপেক্ষাও শতগুণ কষ্ট ভোগ করিতেছি। মা বলিয়া আহ্বান করে, এমন আমার কেহ নাই। আমি কার মুখ চাহিয়া এ সংসারে ধৈর্য্য ধরি। আজি আমি, কত দিন মা-বাক্য শুনি নাই। আমি জানি তুই সরল, উদার এবং পরদুঃখে দুঃখী; কমল! আমাকে একবার মা বলিয়া ডাক্, শুনিয়া হৃদয়ের জ্বালা কথঞ্চিৎ শীতল করি। কমল! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়,—এই দ্যাখ্ আমার পূর্ণযৌবনা স্বর্ণ-প্রতিমা বধূমাতার অবস্থা কি ঘটিয়াছে। এই বলিয়া বধূ কাত্যায়নীকে কমলের নিকট টানিয়া আনিয়া কহিতে লাগিলেন, কমল! এই দ্যাখ্ আমার সোণার প্রতিমা দিন দিন কেমন বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে। মা-আমার দিনযামিনী রোদন করিয়া নয়ন-জলে হৃদয়াগ্নি নির্ব্বাণের বৃথা চেষ্টা করে বটে কিন্তু সেই অশ্রু, অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় বাছার হৃদয়ানলকে শতগুণে প্রজ্বলিত করে। কমল! শিশির-পড়া পদ্মের ন্যায় বধূ কাত্যায়নীর অঙ্গ-যষ্টি অবলোকনে আমি জীবন্মৃত হইয়াছি। বাছা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, পাতিব্রত্যে সাক্ষাৎ সাবিত্রী; বাপ! সতী পতিব্রতার কষ্ট সহ্য হয় না। আমি সাংসারিক সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু বাছার নয়ন-নীর আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে; কমল! তুই পতিব্রতা স্ত্রীর জন্যই পাগল হইয়া সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিস্? একবার চেয়ে দ্যাখ্ দেখি আমার এই স্বর্ণ-পদ্মিনীর কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে। দ্যাখ্ দেখি শিশির-পড়া পদ্মের ন্যায় অশ্রুময় মুখখানি কি ভয়ানক যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে, এই বলিয়া কাত্যায়নীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কমল জ্ঞান হারাইলেন। আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সরোদনে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন জননি! মা! আমার ক্ষমা করুন। এ-মহাপাতকীকে আর যন্ত্রণানলে নিক্ষেপ করিবেন না, আমা হইতে আপনার যত দূর অনিষ্ট ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। আমাকে বিনয় করা আপনার উচিত নহে। আমি আপনার পরম-

শক্র; এই অস্ত্র গ্রহণ করুন; আমি মস্তক অবনত করিয়া দিতেছি, আমাকে বধ করিয়া শান্তি লাভ করুন। পতিব্রতে কাত্যায়নি! এ-পাপাত্মাকে বধ করুন। হা! জগদীশ! আমি কর্ম্মদোষে উভয়কালই নষ্ট করিয়াছি আমার ত্রাণোপায় কি হইবে। বিপিন-জননী কমলের রোদনে দ্বিগুণ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তৎপরে সত্বর কমলের নিকট আগমন করিয়া অঞ্চল দ্বারা কমলের মুখ মুছাইলেন। বধূ কাত্যায়নী সত্বর জল আনিয়া শ্বশ্রূদেবীর হস্তে দিলেন। বৃদ্ধা তদ্দ্বারা কমলের মুখ ধৌত করিয়া দিলেন। কমল কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন এবং ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিজয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ বিনয় রাজাসনে আসীন হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে কমলাকান্ত রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়া "রাজন্! আমায় রক্ষা করুন, পাপাত্মা কমলাকান্ত যায় আমায় রক্ষা করুন" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। বিনয় বহুযত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কমলাকান্ত চৈতন্য লাভ করিয়া কহিলেন মহারাজ! প্রিয়তমা সংরাজবাসিনীর অনুরোধে আপনি আমায় যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, আজি "নরাধম কমলাকান্ত যায় রক্ষা করুন।" বিনয় কহিলেন, মহাশয়! কি হইয়াছে, বলুন, পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা যাইবে। কমল কহিলেন, হে ধরাধিপ! আপনি দয়ার সাগর, আজি দয়া না করিলে কমল যায়, একবার কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করুন। বিনয় কহিলেন আজ্ঞা করুন। কমল কহিলেন একটি ভিক্ষা দিতে আজ্ঞা হয়। বিনয় কহিলেন কি ভিক্ষা; কমল বলিলেন বিপিনের কারামুক্তি ভিক্ষা, এই বলিয়া সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্রমে নিবেদন করিয়া পুনঃপুনঃ কাতর বাক্যে বিপিনের কারামোচন ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। বিনয়, কমলের প্রার্থনাভিক্ষা অতিক্রম করিতে না পারিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রধান কর্ম্মচারীকে

বিপিনের কারামোচনাজ্ঞা পাঠাইয়া দিলেন। কমলের আনন্দের সীমা রহিল না। এই অবসরে মুরলা সংবাদ পাঠাইলেন, স্বামিন্! একবার কমলকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিতে আজ্ঞা হয়, নিতান্ত ইচ্ছা একবার দর্শন করি। কমলাকান্ত মহারাজের সহিত রাজান্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় মুরলা তাঁহাকে ফলজল ভক্ষণ করাইয়া বিদায় দিলেন। কমল তথা হইতে বিদায় লইয়া ভৈরব দেবকে প্রণাম পূর্ব্বক যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

এ-দিকে বিপিন অকস্মাৎ কারামুক্ত হইয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হওত বাটী গমন করিল এবং যথাকালে গৃহে আগমন করিয়া জননীকে প্রণামপূর্ব্বক শুভসংবাদ দিল। বৃদ্ধা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পুত্রমুখে অসংখ্য চুম্ব দিয়া কমলের কৃপায় কারামুক্ত হইয়াছ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। কাত্যায়নী প্রাণকান্তকে পাইয়া স্বকরে আকাশের চন্দ্র পাইলেন। সকল কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। কমলকে মনের সহিত অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া কতই আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নির্দ্দয় কালের মনে কাত্যায়নীর সে সুখ, ভাল লাগিল না। নির্দ্দয়ের কঠোর হৃদয়, কাত্যায়নীর সুখে সুখী হইল না। পাপাত্মার পাপান্তঃকরণ সতী পতিব্রতার আনন্দে আনন্দিত হইল না। বিপিন সেই রাত্রিতেই ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইল। ক্রমে যতই দিন গত হইতে লাগিল বিপিন ততই অবসন্ন হইয়া আসিল। নাড়ীত্যাগ হইল। পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতে-করিতে শয্যাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

বিপিন যখন জানিতে পারিল আর আমি এযাত্রা রক্ষা পাইতেছি না, তখন কমলাকান্তকে দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিল। অন্বেষণকারী অনেক অনুসন্ধান করিয়া কমলকে বিপিনের নিকট আনয়ন করিল। বিপিন কমলাকান্তকে নিকটে বসাইয়া কাতরস্বরে কহিতে লাগিল, অকারণ বন্ধো কমলবাবু! আপনার দর্শনে আজি আমি পবিত্র হইলাম। আমার মনের সকল কষ্ট ভুলিয়া

গেলাম। আপনি যে দেখা দিবেন সে আশা করি নাই। কিন্তু আমি জানি, আপনি নিষ্কলঙ্ক সুধাকর; আপনার ব্যবহার আশ্চর্য্য; আমি আপনার পরম শত্রু; শত্রুকে কিরূপে ক্ষমা করিতে হয় তাহা আপনিই জানেন। আপনার উদার চরিত্র জগতের আদর্শ স্বরূপ; মহাত্মন্! আমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। আপনি আমায় কারামুক্ত করিলেন বটে কিন্তু শমন হস্ত হইতে বিমুক্ত করিতে পারিলেন না। মহাশয়! এ-অন্তিমকালে আমার এক প্রার্থনা আছে, আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হইবে, সে ভিক্ষা ক্ষমা; আমি কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করি আমার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করুন। এই বলিয়া কম্পিত করপুট কমলের দিকে চাহিয়া রহিল। কমল রোদন করিতে করিতে হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, মিত্র বিপিন বাবু! আপনার সমস্ত অপরাধ ঈশ্বর অনেক দিন ক্ষমা করিয়াছেন। আমি এক্ষণে আপনার আজ্ঞাবহ, আজ্ঞা করুন, কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিব? বিপিন কহিল আর এক ভিক্ষা, কমল কহিলেন আজ্ঞা করুন। ভিক্ষা, আমার অন্তে আমার জননীর এবং বালিকা স্ত্রীর ভরণপোষণ করিবেন। কমল কহিলেন, বিপিন! আপনি রোগ মুক্ত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পতিব্রতা কাত্যায়নীর সহবাসে অশেষ সুখে কাল যাপন করুন, ইঁহাদিগের ভরণপোষণের ভার আমার থাকিল। বিপিন শ্রবণ করিয়া নীরব হইলেন। ক্রমে তাহার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া আসিল দেখিয়া কমল রোদন করিতে করিতে অন্তরে বসিলেন। বৃদ্ধা জননী এবং কাত্যায়নী নিকটে বসিয়া বিপিনের শেষাবস্থা দর্শন করিয়া হাহাকার রবে শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা শমনের হৃদয় পাষাণময়; তাঁহাদিগের কাতর বিলাপেও করুণা সঞ্চার হইল না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধার নয়নমণি এবং সতীর হৃদয়-ভূষণ বিপিনকে লইয়া প্রস্থান করিল। জড় দেহ নিস্পন্দ হইয়া শয্যায় পতিত থাকিল। রোদন ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। বৃদ্ধা কাঁদিলেন, বাপ বিপিন! এ হতভাগিনী বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায়

যাও। বাপ ! মা বলিতে আমায় আর কেহ নাই। এতদিনে আমার জগৎ শূন্য হইল। দগ্ধ কপাল ভস্মীভূত হইল। বাপ! আয় একবার চাঁদ মুখে-চুম্ব দিই, আয় একবার মুখে মাই দিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করি। আয় একবার কোলে করিয়া হৃদয় শীতল করি। বিপিন ! আমার জীবনান্ত হইলে আর কে অগ্নিকর্ত্তা হইবে? আর কে তর্পণ করিয়া আমার পিপাসা নিবারণ করিবে? আর কে পিণ্ডদানে এ-দগ্ধ উদরের ক্ষুধা হরণ করিবে? বাপ ! আজি আমি জলগণ্ডূষের ভিখারিণী হইলাম। মনে করিয়াছিলাম পৌত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সুখিনী হইব, তাহা অসার চিন্তা হইল। প্রিয়পুত্র! কাত্যায়নীকে তুমি যে বড় ভাল বাস; আজি তোমার আদরের ধন কাত্যায়নী, তোমার পাদতলে পতিত হইয়া চক্ষু জলে তোমার পা-ভাসাইতেছে; বাপ ! তাহাকে উত্তর দিয়া শীতল কর। অঙ্গ বস্ত্রে তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া রোদন করিতে নিবারণ কর। হা প্রাণ ! তুমি বহির্গত হও। হা হৃদয় ! তুমি ফাটিয়া যাও। আর সহ্য হয় না, উঃ কি যাতনা! এই বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কাত্যায়নীর করুণ বিলাপে পাষাণও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কাত্যায়নী পতির চরণ যুগল ধারণ করিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—

হায় ! কিবা হ'ল মোর, ওরে যম ঘোর চোর,
কি করিলি উহুঃ মরি মরি ! ।
হৃদয় বিদরে যায়, কি করিব হায় ! হায় !
প্রাণনাথে কেন নিলি হরি ॥
প্রাণনাথ প্রাণপতি, তিনি ভিন্ন অন্য গতি,
নাহি মোর আমি যে অবলা।
আমারে প্রদানি দুখ, কিবা হৃদে পেলি সুখ,
নহে বধা উচিত সরলা ॥

রে নিষ্ঠুর ক্রূরমতি, কি হবে আমার গতি,
বিনা পতি হৃদয়ের ধন।
যাঁহারে শরণ করি, সুখে দিবাবিভাবরী,
পাপিনীর ছিল রে জীবন ॥
হেন প্রাণপ্রিয় ধনে, কেন যম অকারণে,
বধিলি, করিলি মোরে সারা।
হায়! হায়! একি দায়, উহুঃ মরি! প্রাণ যায়,
নাহি আর কিছু দেখি চারা ॥
আমি অতি অভাগিনী, কাঙ্গালিনী পাগলিনী
করি পতি কোথায় চলিলে।
এ নহে তোমার কর্ম্ম, এ নহে তোমার ধর্ম্ম,
অবলারে ভাসান সলিলে ॥
আমি নাথ! তবাধীনী, মোরে করে অনাথিনী,
যাওয়া তব উচিত কি হয়?।
মম হৃদে হানি বাজ, করা তব এই কাজ,
ছি ছি নাথ! ভাল নয় নয় ॥
তাই বলি অয়ি নাথ!, করি শত প্রণিপাত,
এই ভিক্ষা দিয়ে রক্ষা কর।
যদি ত্রিদিবের তরে, রহিতে না চাহ ঘরে,
ধর ধর মোর বাক্য ধর ॥
আমারে লইয়া সঙ্গে, চল নাথ! রঙ্গে ভঙ্গে,
অঙ্গে অঙ্গ করিয়া অর্পণ।
সুখে যাবে আমি যাব, কত সুখ পাবে পাব,
নাহি ইথে অন্যথা কখন ॥
আমারে রাখিয়া বাসে, যাওয়া তব পরবাসে,
কোন্ আসে আমারে বল না?

মনে কি ভেবেছ নাথ!, যক্ষ নাগ কন্যা সাথ,
অথবা কিন্নর সুরাঙ্গনা॥
সুখে রবে চিরদিন, কিন্তু দাসী তবাধীন,
প্রাণান্তেও না দেবে কখন।
সুরপুরে যাব আমি, লইব আপন স্বামী,
তা সবার নাশিব মনন॥
তুমি যে সতীর ধন, মোর ধন কেনা ধন,
এ ধনে আমার অধিকার।
জগতের কর্ত্তা যিনি, পক্ষপাত শূন্য তিনি,
তাঁর কাছে নাহি অবিচার।
বিচারে অচিরে পাব, স্বীয় সতীত্ব দেখাব,
তাহাতে নাহিক কিছু ভুল।
কিন্তু নাথ! এই খেদ, মরম করিছে ভেদ,
নিঠুর নাহিক তব তুল॥
ওরে রে কঠিন প্রাণ, এই বেলা লয়ে মান,
প্রস্থান করহ নিজ স্থানে।
যার দেহে করি বাস, ক'রে ছিলি সুখ আশ,
সুখনিধি ম'রেছে পরাণে॥
আর নাহি পাবি সুখ, কেবল ভুঞ্জিবি দুখ,
দূর্ দূর্ দূর্ হরে অসু।
রে হৃদি পাষাণ হও, আর কেন দুখ সও,
ধর আজ্ঞা পূর্ণ কর আশু॥
আমি পতিব্রতা নারী, আর যে সহিতে নারি,
পতির বিরহ অন্তরাল।
মোর প্রতি কৃপাবান্, হ'য়ে কর কৃপা দান,
নাশ আশু অসু ওরে কাল॥

জীবনে কি কাজ মম, লও লও ওরে যম,
আর যে বাঁচিতে সাধ নাই।
এখন মরণ হ'লে, আমার সুভাগ্য বলে,
যাই চলে প্রিয়তম ঠাঁই॥
অয়ি মাতঃ বসুন্ধরে! পাপিনীরে গর্ভে ধ'রে,
কষ্টমাত্র ভোগ হ'ল সার।
এখন বিতরি দয়া, দেহ মাতঃ পদছায়া,
অধীনীর যাক্ দুখ ভার॥
হে জননি! সযতনে, ক'রে ছিলে যেই জনে,
আমার এ দেহ সমর্পণ।
সেই জন অকারণে, মোরে ফেলে ঘোর বনে,
সুরলোকে করেছে গমন॥
এই দেহ এই মন, এই প্রাণ এ যৌবন,
যাঁহার আছিল অধিকারে।
তিনি প্রাপ্ত যথা লয়, এরা যেন তথা লয়,
পায় এই ভিক্ষা বারে বারে॥
ওহে বিধি দয়াময়! জ্ঞানময় শিবময়,
এ আময় কি জন্য আমায়।
তুমি জগতের পিতা, তাপিনী তব দুহিতা,
ভক্তিমতী সর্ব্বদা তোমায়॥
কন্যারে বিধবা করা, একি পিতঃ! তব ধারা,
বাপের উচিত কার্য্য নয়।
কন্যার সুখের তরে, ভ্রমি এই চরাচরে,
যোগ্য পাত্রে দেন পরিণয়॥
তদন্তে যৌতুক দানে, "চিরজীবেতি" কল্যাণে,
তুষ্টে, তিনি, জামাতা কন্যায়।

হবে কেন কেন বাপ! প্রদান আমায় তাপ,
বল পিতঃ বলহ আমায়॥
কি করিব কোথা যাব, কেমনে পতিরে পাব,
উহুঃ মাগো মরি মরি মরি!॥
সব হেরি শূন্যাকার, না দেখি আকার কার,
একি হ'ল হরি! হরি! হরি!॥
অয়ি উচ্চ লোকবাসি, দেবগণ মোরে আসি,
দাও মোরে প্রিয় সমাচার।
বিনে এই প্রাণামার, সব হেরি অন্ধকার,
হৃদি ফেটে উঠে অনিবার॥
রে বসন রে ভূষণ! শয়নীয় সুশোভন,
আর মোর নাহি প্রয়োজন।
যাঁর জন্যে তোরা সব, তিনি যে হ'লেন শব,
শবে সব মিশ এইক্ষণ॥
অবলা সরলা বালা, কত বা সহিবে জ্বালা,
ঝালাপালা প্রাণে অবিরত।
বসন ভূষণ সব, দূরে করি দূরীভব,
হ'ল সদা রোদনেতে রত॥

কমল দেখিয়া শুনিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এই ভাবে গেল। পরে বিপিনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। কয়েক দিন পরে কমল নিজ সম্পত্তির কিয়দংশ বিপিনের জননীর এবং তাহার স্ত্রীর ভরণপোষণার্থ প্রদান করিয়া শূন্য হৃদয়ে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়! ঐ-যে পথোপরি পাগলিনীর বেশে ভ্রমণ পরায়ণা রমণীকে দর্শন করিতেছেন, ও—কে, কিছু কি অনুভব করিতে পারিয়াছেন? এত যে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, এত যে বালক বালিকার প্রহার

যাতনা ভোগ করিতেছে, এত যে শীর্ণ কলেবর হইয়াছে, তথাচ দেখিয়াছেন ? রূপ মাধুরী অন্তর্হিত হয় নাই !

এ-রমণী সময়ে যে পরমাসুন্দরী ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বিলক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। পাঠকমহাশয় ! এ-সেই কুসুম কুমারী ; কারাগৃহে অবস্থান কালে রূপশোভায় তত্রস্থ কোন প্রধান ব্যক্তিকে বিমোহিত করে। তৎসহবাসে গর্ভ সঞ্চার হয়। পরে পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে কয়েক দিন লালন পালন করে। তদনন্তর সেই শিশু হতভাগিনী বারবিলাসিনীর ক্রোড়েই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কুসুম গণিকা হইলেও ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া শোকদুঃখে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে কারামুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু চিত্তবৃত্তির স্থিরতা হয় নাই। বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। হতভাগিনী বুদ্ধির ভ্রমে নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম করিয়া করিয়া এইরূপে জীবন যাপন করিতেছে। আহা ! ইহার বর্ত্তমান অবস্থা কি ভয়ানক শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে !

পাঠক ! চলুন এক্ষণে কুসুমকুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া, কমলাকান্তের কার্য্যাবলি দর্শন করি। ঐ দেখুন সরোজবাসিনীর বিরহে কমল কেমন শূন্য হৃদয়ে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। পরিবারবর্গ বিশেষ যত্ন করিয়াও তাহাকে গৃহবাসী করিতে পারিতেছেন না। দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর-ক্রমে, দেখুন কতবৎসর গত হইয়া গেল, তথাচ কমলের অন্তঃকরণে সরোজবিষয়ক চিন্তার হ্রাস হইল না বরং সেই চিন্তা দিন দিন নবীভাবাপন্ন হইতেছে।

সংসার চক্রে বদ্ধ জীবের দশা নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। এক অবস্থায় থাকে না। আশা, অবস্থার অনুগামিনী ; যখন অদৃষ্ট দোষে মনুষ্যের দুঃসময় উপস্থিত হয়, আশা সেই সময় সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার মনের দুঃখ দূর করিতে থাকে। লোকে আশার মায়ায় মোহিত হইয়া মনে মনে কত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিবার সঙ্কল্প

করে। কল্পনা সতী, আশার প্রিয় সঙ্গিনী; তিনিও সেই সময় উপস্থিত হইয়া দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তির কতই সাহায্য করিয়া থাকেন। অধঃ পতিত জন, কল্পনার বলে মনে মনে অখণ্ড পৃথিবীর অধিপতি হইয়া প্রবল প্রতাপে স্থলজল কম্পিত করিতে থাকে। নিজের দুরবস্থা ভুলিয়া যায়, অসহ্য কষ্টকে মনহইতে দূর করিয়া দেয়। তাহার মুখশ্রী এক মনোহারিণী কান্তি ধারণ করিতে থাকে। সে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মুনি ঋষিকেও হারাইয়া দেয়। বস্তুতঃ ঈশ্বর যদি তাঁহার সৃষ্টি কৌশলে এই সকল অপূর্ব্ব কৌশল স্থাপন না করিতেন তবে এই সংসার দুঃখের আগার হইত। মহত্তর কার্য্য সকল কখনই সুসম্পন্ন হইত না। আশার আশ্বাসিনী শক্তির ইয়ত্তা নাই। কল্পনার কল্পনা শক্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট করে এমন লোক জগতে নাই। আশা আমাদিগকে অতি সামান্য বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরের অভয়-পদ পর্য্যন্ত প্রদান করে। যদি এই আশার সহিত আবার ন্যায়, ধর্ম্ম, বিবেক আসিয়া যোগ দেয় তাহা হইলে সুখের সীমা থাকে না। যে ব্যক্তির হৃদয়-সংসারে এই সকল মহা-ব্যক্তি বাস করে, তাহার তুল্য সুখী এজগতে কে আছে? তিনি নরলোকবাসী হইয়াও স্বর্গীয় পুরুষ; তিনি সংসার প্রপঞ্চে অভিভূত নহেন। চতুর কাল তাঁহাকে ফাঁকি দিতে পারে না। দুষ্প্রবৃত্তি সকল তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে। সে রূপ লোক জগতে অতি বিরল; সংসারের পিচ্ছিল পথে পরিভ্রমণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পদে পদে পদস্খলন হইয়া পতিত হইতে হয়। যিনি চতুর তিনি সাবধানে পদ বিক্ষেপ করেন। পাপের ফল দুঃখ, ইহা সংসারের অনিবার্য্য নিয়ম; যিনি যে পরিমাণে অকার্য্য করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে আত্মগ্লানি ভোগ করিবেন। ঐ দেখুন কমলাকান্ত এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া নিজের অবস্থা, কার্য্য, সংসারের অসারতা, কালের গতি, বন্ধুবান্ধবের অবস্থা, বিপিনের মৃত্যু, বৃদ্ধার খেদ, কাত্যায়নীর বিলাপ, সঙ্গি সকলের পূর্ব্বকৃত সেই সেই কার্য্য, তাহার ফলাফল,

বিনয়ের উদারতা, সরোজবাসিনীর অবস্থা, জগতের আদি, অন্ত, মধ্য, নিজের পরিণাম, এবং তাহার ভাবী ব্যবস্থার ফলাফল, এই সকল চিন্তা করত কেমন একপ্রকার মুখভঙ্গি প্রকাশ করিতে করিতে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন।

কমলাকান্ত এইরূপ অবস্থায় অবস্থাপিত আছেন এমন সময়ে, এক অশ্বারোহী পুরুষ আগমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিল। মহাশয়! আমি ধারারাজ্য হইতে আগমন করিতেছি, এই মহারাজাধিরাজের পত্র গ্রহণ করুন। কমলাকান্ত বিনয়ের নামাঙ্কিত পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন "প্রিয়তম কমল! প্রিয় ভগিনী সরোজবাসিনীকে সন্ন্যাসিনীর বেশে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি আমাদিগের বিপদুদ্ধারিণী; তুমি আসিলে সকল কহিব। আমি মুরলার দ্বারা তাঁহাকে সংসারবাসিনী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত আছি। কিন্তু তাঁহার মনের যেরূপ ভাব তাহাতে যে সংসারে প্রবিষ্ট হইবেন এরূপ বোধ হয় না। আমি যে, তোমাকে আনিতে লোক পাঠাইলাম তাহা সরোজ জানেন না। তুমি সত্বর আগমন করিয়া যাহাতে সতী পতিব্রতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন এরূপ করিবে। সত্বর আসিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।"

শ্রীবিনয়।

কমল পত্র পাঠ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া তৎক্ষণাৎ ধারারাজ্যে গমন করিলেন। যত শীঘ্র আসা যায় তত শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হংসকেতু এবং বিনয়, কমলকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, কারণ তাঁহার আগমনের কোন ফলই ফলিল না। সরোজ অদ্য কয়েক দিন হইল, তথা হইতে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন। কমল সরোজের সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া এবং তাহার পতিভক্তির সবিশেষ পরিচয় পাইয়া ক্ষিপ্তের উপর ক্ষিপ্ত হইলেন। সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিলেন। বিনয় নানাবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া নিজালয়ে আনিতে চেষ্টা

পাইলেন। কিন্তু কমল আর গৃহে থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে সরোজের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলন। বিনয়ও তাহাতে কোন বাধা দিলেন না। এক দিন কমল ভ্রমণ করিতে করিতে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম প্রযুক্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া এক তরঙ্গিণী তীরে উপস্থিত হইয়া নীরে নামিলেন, জলপান করিলেন, পুনর্ব্বার তীরে উঠিলেন। তীরস্থ এক বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া উর্দ্ধনয়নে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিলেন পরে কহিতে লাগিলেন—

ওহে উচ্চ শ্যামবর্ণ মহাকায় বট।
ঢাকিয়া বৃহত শাখে, তটিনীর তট॥
আহা! কিবা মনোলোভা, ধ'রেছে আশ্চর্য্য শোভা,
দেখিয়া মানসে হয় ভাবের সঞ্চার।
দ্বিজগণে তব ফল ভুঞ্জে অনিবার॥

আহা! কি প্রফুল্ল মনে আছে খগকুল।
মহতের আশ্রয়ের নাহি সমতুল।
মহতের এই রীতি— আচার ভদ্রতা নীতি,
সর্ব্বদা মঙ্গল প্রসূ হয় ধরাতলে।
অতিথিরে তোষে তারা অন্ন জল ফলে॥

ধন্য ধন্য ওহে বট জনম তোমার।
বিবিধ প্রাণীর তুমি হ'য়েছ আধার॥
তব শাখে ওহে শাখী, ঝাঁকে ঝাঁকে বসি পাখী,
করিছে আনন্দে কিবা সুমধুর গান।
শুনিয়া সবার হয় পুলকিত প্রাণ॥

পুলকের হেতু তুমি, হও অনুক্ষণ।
এজন্য ত্যজিতে নারে বিহঙ্গমগণ॥
অভ্রভেদী শাখা পরে, নীড় বাঁধি বাস করে,
কদাচিৎ নাহি পায় শত্রুর তাড়না।
কি যে সুখে থাকে খগ কি দিব তুলনা॥

তোমার উচ্চতা গুণে ওহে তরুবর!।
স্বচ্ছন্দ অন্তরে দ্বিজ থাকে নিরন্তর॥
শাবক কুলের তরে, ক্ষণেক না শঙ্কা করে,
পক্ষিণী প্রফুল্লমনে প্রিয়তম সহ।
ডালে ডালে লম্ফে ঝম্পে ফেরে অহরহ॥

সংসারের ঘোর দায়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ।
থরহরি করে ব্যাপ্ত ভুবে ভ্রাম্যমাণ—
প্রতপ্ত পথিক জন, লইলে তব শরণ,
সুশীতল সমীরণ করাও সেবন।
অন্য পাখী গান সহ কোকিল কূজন॥

হেরিলে তোমার এই রূপ বিমোহন!।
এক কালে মুগ্ধ হয়ে যায় পথিজন॥
বাসকরি তবতলে, অন্ন রাঁধি কুতূহলে,
পথিক প্রফুল্ল মনে করয়ে ভক্ষণ।
অনুগতা তরঙ্গিণী বিতরে জীবন॥

অতিথির সেবায় তুমিহে বিচক্ষণ।
কোন অঙ্গ অসম্পূর্ণ রাখ না কখন॥
নিদ্রাজন্য পথিকের, শয্যা দাও সুপর্ণের,
মৃদুভাবে কর পাতা-চামর ব্যজন।
সুনিদ্রায় শান্তি লাভ করে শ্রান্ত জন॥

আহা! কিবা কার্য্যাবলী কর ওহে তরু।
কোনটিই লঘু নয় প্রত্যেকেই গুরু॥
ধন্য ধন্য তরুবর, তব কার্য্য প্রীতিকর,
ধন্য ধন্য শত ধন্য দিই হে তোমারে।
তুমিই পরম-সাধু এভব সংসারে॥

বিপদে পড়িয়া যত স্বার্থবাহগণ।
তোমার নিকটে তারা লয় হে শরণ॥
বিপন্নেরে স্থান দেহ, এজন্য অমর দেহ,
কৃপা করি ওহে তরু দিয়াছেন ধাতা।
গুণের অধীন হন সেই বিশ্ব পিতা॥

ঈশ যে তোমার প্রতি সদা অনুকূল।
সে পক্ষেতে কিছুমাত্র নাহি দেখি ভুল॥
করি তিনি অনুরাগ, শ্যাম অঙ্গে পদ্ম রাগ,
মণি তারে ক'রেছেন অতি সুশোভিত।
দেখিলে না হয় কার মানস মোহিত।

যে জন শরণ আসি করে হে গ্রহণ।
হর তার শোক তাপ সুস্থ কর মন॥
তবে কেন অভাগার, শেষ নহে যাতনার,
সুধাই তোমারে তরু বল হে আমায়।
কি করিব কোথা যাবো কি হবে উপায়॥

শুনেছি জ্ঞানীর মুখে মীমাংসা বচন।
তোমার পরশে স্নিগ্ধ হয় সমীরণ॥
কি করিব হায় হায়! উহুঃ মরি প্রাণ যায়,
বল মোরে তবে কেন "জগত পরাণ"।
দিবা নিশি দহে দেহ অনল সমান॥

শীতল হইব বলি সুধাকর করে।
নিশিতে ভ্রমণ করি কাতর অন্তরে॥
তাহাতে না ফল ফলে, অন্তর দ্বিগুণ জ্বলে
মনের যাতনা ভরে করিহে রোদন।
তখন বিবেক দেয় প্রবোধ বচন—

—সুধাকরে সুধাক্ষরে কে তোমায় বলে?
কেবল বিষের বৃষ্টি হয় ধরাতলে॥
শুন হে কমলাকান্ত ধৈর্য্যধর, হও শান্ত,
প্রভাত প্রদোষ সূর্য্যে ভেবো না রমণ।
তব পক্ষে প্রকৃতির আরক্ত লোচন॥

সরোজের সঙ্গে সুখ গিয়াছে তোমার।
ভাবিলে কি হবে বল ভেবো নাকো আর॥
ভ'রেছ পাপের ভরা, ব্যবসায়ে কর ত্বরা,
লাভ কর পাপফল দ্বিগুণ দ্বিগুণ।
জ্বলুক হৃদয়ে তব দুখের আগুন॥

বেশ্যাপদ সেবী তুমি অতি দুরাচার।
ধর্ম্ম পত্নী পরিত্যাগী নারকী নচ্ছার॥
যে কর্ম্ম ক'রেছ তার, দুঃখ ভোগ অনিবার,
ভাবিলে কি হবে বল ভেবো নাকো আর।
সরোজের সঙ্গে সুখ গিয়াছে তোমার॥

অয়ি তরঙ্গিণি ধনি! সুধাই তোমারে।
বহুদূর হ'তে যাহ পতি দেখিবারে॥
মাঠে বনে কি বন্দরে, দেখেছ কি সরোজেরে?
বার্ত্তা ব'লে অভাগার রাখহ জীবন।
স্থির হও কথা শুন, না কর গমন॥

পতি দেখিবারে হ'য়ে আনন্দে মগন।
চঞ্চল প্রবাহে ধনি! করিছ গমন॥
সময় করিতে নাশ— নহে তব অভিলাষ,
বুঝেছি বুঝেছি সতি! তোমার মনন।
কুল কুল রবে তাই অকূলে গমন॥

আলিঙ্গন চুম্বদানে তুষিতে প্রাণেশ।
অতিক্রম করি তাই যাও বহুদেশ ॥
নাহি দেখি হেন জন, করে গতি নিবারণ,
প্রবল প্রবাহে যাহ পতির সকাশ।
নিভাতে মনের জ্বালা পূরাইতে আশ ॥

সুধাই তোমারে আমি অয়ি তরঙ্গিণি!
তোমার মতন মম সরোজবাসিনী।
আসিবে কি? দুঃখভার, বিনাশিতে অভাগার
আর কি সে মুখশশী হেরিবে নয়ন?
জানাইবে দগ্ধ মন হৃদয় বেদন ॥

অভাগার বাক্য বাণে সদাহৃদি দহে।
সন্ন্যাসিনী পাগলিনী পতির বিরহে ॥
অবলা সরলা বালা, কত আর সবে জ্বালা,
রাখিবে কি? সযতনে শরীর জীবন।
তুষিবে কি? পামরের পাপাসক্ত মন ॥

সাধ্বী সতী পতিব্রতা নারী শিরোমণি।
রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণী ॥
রাখিতে পতির মান, পতি-পদ করে ধ্যান।
সতীত্ব পরম রত্ন করিতে রক্ষণ—
প্রাণপণে করিতেছে কতই যতন ॥

এমন রমণী ধনে হইয়া বঞ্চিত
পাপদেহে প্রাণ! তোর্ থাকা কি উচিত?
তাই বলি মানে মানে, যারে প্রাণ নিজস্থানে,
মরিলে কমলাকান্ত বাঁচেরে এখন।
পারি না সহিতে আর হৃদয় বেদন॥

এইরূপে বিলাপ করিয়া সরোজের অনুসন্ধানে যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। ওদিকে সরোজও গুপ্তভাবে পতির পদ দর্শনে যত্নবতী হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্র।

কমলাকান্ত প্রস্থান করিবার কয়েক দিন পরে, বিনয় মুরলাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ হংসকেতু, নগেন্দ্রকে সঙ্গে দিয়া নবীনকালীকে কিরাতরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন।

এক দিন নগেন্দ্র রাজাসনে আসীন হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে, এক রাজপুরুষ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত, কয়েক জন মধ্যবর্ত্তী ভদ্র এবং কয়েক জন ইতর লোককে লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। অভ্যাগত সকলেও যথা রীতি রাজসম্মান রক্ষা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিল।

নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন উপেন্দ্র! ইহাদিগকে কি জন্য আনয়ন করিয়াছ? রাজপুরুষের নাম উপেন্দ্র; উপেন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! এই তিন ব্যক্তি জমীদার, ইজারদার এবং দরইজারদার; আর এই তিন ব্যক্তি তালুকদার, পত্তনদার এবং দরপত্তনদার, অপর সকলে আপনার প্রজা; এই মহাশয়গণ, আপনার রাজ্যের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়া প্রজাগণের উপর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা একবার প্রকৃতিবর্গের মুখে শ্রবণ করিলে কৃতার্থ হই। এই বলিয়া নীরব হইলেন।

ভূপতি, উপেন্দ্রের বাক্য শ্রবণে দোলায়মান চিত্ত হইয়া, প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস সকল! আমি রাজা, তোমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা; আমাকে প্রতারণা করিও না, এই জমীদারগণের ভয়ে ভীত হইয়া কোন কথা গোপন করিও না, তোমাদিগকে আমার দিব্য—ইহাদিগের দ্বারা কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছ—অসঙ্কুচিতচিত্তে নিবেদন করিয়া, আমার চঞ্চল-চিত্তকে সুস্থির কর।

প্রথম ভদ্র ব্যক্তি কহিলেন, দীনবন্ধো! যুবরাজ! আমরা স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে অবস্থান করিতেছি বটে, কিন্তু এই জমীদার মহাপ্রভুদিগের অধীনে থাকিয়া, আমাদিগের মান সম্ভ্রম কিছুই নাই। রাজন্! দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিগণের শাসন জন্য অনেক বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা বলবানের নিমিত্ত নহে, মৎসদৃশ দুর্ব্বল প্রজাগণের নিমিত্ত; আইন আমাদের মৃত্যুর জন্য এবং ধন বলবান্কে প্রশ্রয় দিবার নিমিত্ত হইয়াছে। জমীদার মহাশয়গণ, নায়েব নামে সাক্ষাৎ শমন সদৃশ এক এক মহাত্মাকে প্রেরণ করিয়া, আপনার প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়-রক্ত যেরূপ নির্দ্দয় ভাবে শোষণ করিয়া থাকেন, তাহা আমি এক মুখে বর্ণন করিতে অক্ষম; ইহাদের অত্যাচারের সহিত তুলনা করিলে সিরাজোদ্দৌলা, মীরণ প্রভৃতি যবনগণকে সাধু পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। সরোবরের মৎস্য, উদ্যানের ফলমূল, ক্ষেত্রের সরুধানা, ইহা প্রায় আমাদিগের ভোগে আইসে না। জমীদার মহাশয়ের, কিম্বা নায়েব মহাশয়ের গৃহে

কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, প্রজামাত্রকেই উল্লিখিত দ্রব্য সকল উপস্থিত করিতে হয়। কেহ দিতে অসম্মত হইলে, তাহার রক্ষা নাই। নায়েব মহাশয়ের পাদুকা প্রহারে, তাহার অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়। অর্থদণ্ড প্রদান করিতে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে হয়। জমীদার এবং নায়েব মহাশয়কে প্রণামি এবং দর্শনি প্রদান করিতে করিতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। রাজন্! আজি জমীদার মহাশয়ের সন্তানের বিবাহ, কাল বধূর দ্বিতীয় বিবাহ, পরশ্ব দৌহিত্রের অন্নাশন, তৎপরে পিতার শ্রাদ্ধ, অদ্য সমন্বয়, ইত্যাদি কার্য্যে অর্থ, এবং দ্রব্য সামগ্রী সাহায্য না করিলে আমাদিগের রক্ষা নাই। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই—জমীদার আর এই রাক্ষস নায়েবের অন্যায় প্রহারে জর্জ্জরিত। প্রজার রক্ষা জন্য আপনার বিচারালয় স্থাপিত আছে সত্য, কিন্তু কাহার সাধ্য তাহাতে আসিয়া অভিযোগ করে। মা'র খাইয়াও নীরবে কাঁদিতে হয়, ইচ্ছা না থাকিলেও পূজা করিতে হয়। সামান্য সামান্য কারণে দণ্ডিত প্রজাগণ অর্থদণ্ড প্রদান করিতে করিতে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। আর উদরান্ন চলে না। বিষয় বিভব আর থাকে না। সকল গেল, সকল খাইল; উঃ কি যাতনা! রাজন্! ইহাদের দয়া, ধর্ম্ম, জিতেন্দ্রিয়তা না থাকিলেও, ইহাদিগকে দয়াময়, পরম ধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিতে হয়। এই অবসরে এক কৃষক কহিল, ঠাকুর মুশয় একবার আম্‌গার আজাকে খাজনার কথা বলিকেল। আগে মুই নসিকা খাজ্‌না কত্তাম, এখন দরইজাদ্দার পাঁচ টাকা ন্যাচ্চে, তবু সাম্নির ভাইর মন ওঠে না। দ্বিতীয় কৃষক কহিল, আরে থাম্ এই শালার জমীদার সেবার গাঁয়ে এসে আমার পাঁচ মাস প্যাটঅওলা মেয়েটার জাৎটে খেয়ে প্যাটের ছাবালটাকে মেরে ফ্যাল্লে, আহা! বাচা আমার গা-তুলি এক মাস উট্‌তি পার্‌লে না, আগে সে কতাটা বল্। তৃতীয় কহিল, এই তালুকদার্‌টা আম্‌গার (ভাই) না কল্লে কি, ত্যারো বচরের বৌ-টো-কে একবারে মেরে ফুলে

ছ্যালো। চতুর্থ যবন প্রজা কহিল, হুজুর আম্‌গার ফুলু বিবির কথা বল্লি না—হ্যাঁহু হ'য়ে যবন পজ্জন্ত র‍্যাৎ ক'ল্লে না—ইচ্ছে করে মাম্নির ভাইদের ঘর ঢুকি, একে একে বেচে বেচে জাত খেয়ে জাতির দপা রপা ক'রে দি।

যুবরাজ নগেন্দ্র কহিলেন, আর না, ক্ষান্ত হও। আর আমাকে দুঃখানলে নিঃক্ষেপ করিও না। অদ্য হইতে তোমাদের সকল কষ্ট বিমোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম। এই বলিয়া পামরগণকে দণ্ড দিয়া রাজশাসনের এমনই সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, অল্প দিনেই প্রকৃতিপুঞ্জ সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইল।

কে তুমি ভুবনমোহিনী ?

পাঠক মহাশয়! পূর্ব্বে আপনি চন্দ্রচূড়ের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। মহারাজ হংসকেতু বনবিভাগে যে নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, পিতৃদেবের স্মরণার্থ তাহার নাম রুদ্রপুর রাখা হইয়াছে। সেনাপতি প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহ; চন্দ্রচূড়ের রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। অমরের অনভিমতে চন্দ্রচূড়ের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। রুদ্রপুর আর বনরাজ্য নাই। মনোহর নগরে অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং বন্যমনুষ্যগণের বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিরাতরাজ্যের রাজধানী "চারুপুরী" হইতে আরম্ভ হইয়া রুদ্রপুরের মধ্য দিয়া ধারা নগর পর্য্যন্ত এক পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন সুদীর্ঘ রাজপথ, নগেন্দ্রের যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ শ্রেণী, অল্প অল্প ব্যবধানে পান্থনিবাস, কূপ, ভৃত্যসম্বলিত রাজযোগ্য গৃহ বিরাজমান আছে। যুবরাজ নগেন্দ্রের যখন ইচ্ছা হয়, তখনই রুদ্রপুরে কিম্বা ধারা-নগরে আগমন করিয়া থাকেন। পথে কোন বিঘ্ন না থাকায়, সময়ে সময়ে একাকীও আগমন করেন।

কোন সময়ে যুবরাজ একাকী অশ্বারোহণে রুদ্রপুরে আগমন করিতেছিলেন। এক দিন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে এমন সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পথশ্রম নিবন্ধন অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়াতে এক চতুষ্পথ প্রান্তস্থ বৃক্ষমূলে অশ্ব বন্ধন করিয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন পথের কিঞ্চিৎ অন্তরে, এক মনোহর সরোবর, সময়-ধর্ম্মে সমধিক সুশোভিত হইয়া, মানবের মনোহরণ করিতেছে। নির্ম্মল নীল জল, দক্ষিণবায়ু প্রভাবে তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া নব-বিকশিত-নলিনী-মালাকে তালে তালে নাচাইতেছে। মধুপানে প্রমত্ত-মধুপ-সকল, মনের আনন্দে গুন্ গুন্ স্বরে উড়িয়া বেড়াইতেছে। হংস, সারস, চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণে মনের আনন্দে সাঁতার দিতেছে। কোথাও খঞ্জন, কমলোপরি উপবিষ্ট হইয়া, মনোহর নৃত্যে মনঃপ্রাণ হরণ করিতেছে। তীরস্থ শাখীশাখাসীন-পরপুষ্ট, মধুর-স্বরে শ্রবণ বিবরে অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছে। যুবরাজ স্বভাবের হৃদয়-হারিণী শোভায় বিমোহিত হইয়া, মৃদুমন্দ গমনে তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতেই—শরীর অচঞ্চল; মন অচঞ্চল; নয়ন-বিস্ফারিত, চকিত এবং অচঞ্চল; বৃত্তি-প্রধান-বিবেক-উদ্ভ্রান্ত এবং সন্দেহ দোলায় দোলায়মান; যাহা দেখিতেছেন তাহাতেই সন্দেহ, এমন হয় না!! হবার নয়!! এত সন্দেহ কেন? তবে কি কোন অপার্থিব বিষয় দেখিতেছেন? তাহাও নয়; অদৃষ্ট-পূর্ব্ব-বস্তুর নূতন আবির্ভাবই সন্দেহের কারণ; নগেন্দ্র কি দেখিতেছেন? তাহা বলিতে অসমর্থ; যুবরাজ এখন আনন্দময় হ্রদে, অমৃতময় সমুদ্রে, চন্দ্রিকাময়ী নদীতে ডুবিতেছেন। স্বকরে, সুধাকর ধরিতেছেন; সশরীরে সপ্তস্বর্গে বিচরণ করিতেছেন; আর—এক অপূর্ব্ব সুখভোগ করিতেছেন: আজি এক অপূর্ব্ব ভাব; আজি এক অপূর্ব্ব অবস্থা; ক্রমে শরীর কম্পিত, অঙ্গুলি স্বেদজলে অলঙ্কৃত, লজ্জা তিরোহিত, এবং

ধৈর্য্য বিচ্যুত হইল। যুবরাজ আজি আত্মদমনে অসমর্থ; আজি এক নূতন পথের পথিক; আজি এক নূতন ভাবের ভাবুক; যে সুখ কখন স্বপ্নেও ভোগ করেন নাই, তাহাই আজি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ করিতেছেন। আজি বালসুহৃদ্ অন্তঃকরণকে অন্যের সহিত বিনিময় করিতেছেন এবং হৃদয়-মধ্যে এক অপূর্ব্ব প্রেমময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত দেখিতেছেন। যুবরাজ! ইতঃপূর্ব্বে যাহা আপনি পুরোভাগে দেখিতেছিলেন, তাহাই এক্ষণে আপনার হৃদয়ধামে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আর আপনি সাবধান হইতে পারিলেন না। আপনার মনঃ প্রাণ সকলই অপহৃত হইল। আবার তাহাও বলি,—আপনি কি কেবল, প্রিয় পদার্থ সকল হারাইলেন আর কিছুই পাইলেন না, তবে প্রাণ হারাইয়া কেমন করিয়া জীবিত আছেন? বুঝিলাম আপনিও চোর, যেমন মনঃপ্রাণ হারাইয়াছেন তেমনই, চুরী করিয়া পূর্ণ করিয়াছেন। আজি আমি মুক্তকণ্ঠে বলি, একবার নয় শতবার বলি, আপনিও মন-চোর, এবং প্রাণ-চোর; এমন চোরের স্বভাব কবে হইল? যুবরাজ! এইবার আপনি ফাঁদে পড়িলেন, চোরের দণ্ড কারাগার ইহা প্রসিদ্ধই আছে, এইবার আপনি এক অপূর্ব্ব কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আর মৌনাবলম্বনের প্রয়োজন কি? কি দেখিতেছেন, প্রকাশ করিয়া বলুন, শুনিবার নিমিত্ত পাঠক অতিশয় চঞ্চল হইয়াছেন। কি দেখিতেছেন—জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির ফল স্বরূপ প্রেমময়ী অমৃতময়ী মনোমোহিনী রমণী মূর্ত্তি; স্থির হউন, একবার চারিচক্ষু একত্রিত করিয়া জীবন সার্থক করুন। একবার নয়ন ভরিয়া, মন ভরিয়া প্রেমের সহিত, মনের ভাবের সহিত, আপনার হৃদয়হারিণীকে দর্শন করুন। পাঠক! যুবরাজ যাহা দেখিতেছেন, তাহা এক রমণী রত্ন; নাম ইন্দুবালা, রমণীকুলের শিরোমণি; মাধুরীর পূর্ণামূর্ত্তি; রূপের তুলনা নাই, দশদিক্ আলো করিয়া আছে; গুণেরও তুলনা নাই। আমি কি উপায় অবলম্বন

করিয়া যে, এতাদৃশী রমণী মূর্ত্তি পাঠক মহাশয়ের চিত্রপটে চিত্রিত করিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। ইন্দুবালা যুবতী নহে, বালিকাও নহে, অপূর্ণ যৌবনা, চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্কা, মুখে এবং স্বভাবে আজিও এক একটু বালিকা ভাব প্রকাশমান; রূপের তুলনা নাই। দুগ্ধ-অলক্তক অপেক্ষাও মনোহর; গোলাপ কুসুমাপেক্ষাও রমণীয়, চম্পক অপেক্ষাও কান্তি বিশিষ্ট, এ-রূপমাধুরী, ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রভাময়ী নহে; এ-রূপে, চক্ষু দগ্ধ হয় না; পাঠক! উৎকৃষ্ট পদার্থচয়ের উৎকৃষ্ট বর্ণ সকল সঙ্কলন করুন। তাহাতে যে বর্ণ ফলিবে, তাহার দোষ ভাগ ত্যাগ করিয়া যে মনঃপ্রাণ বিমোহন বর্ণ ফলিবে ইন্দুবালা, সেই বর্ণে অলঙ্কৃতা; কেশ অতি সূক্ষ্ম, সদীর্ঘ, অরাল; বর্ণে নবীন নীরদাবলি-সদৃশ; এবং একমাত্র বেণী দ্বারা সম্বদ্ধ, তাহার অগ্রভাগে লম্বমান রত্নমালা; ললাট ফলক না-বিশাল, না সঙ্কোচ, না গোলাল; এই তিনের সুসংমিলন, সুগঠন এবং সুসংস্থাপন; নিন্দার লেশ মাত্র নাই। কন্দর্প শরাসন বিনিন্দি ভ্রূযুগল যোড়া, আবক্র, মধ্যস্থূল, এবং প্রান্তদ্বয় সূক্ষ্ম; নয়ন আকর্ণ বিশ্রান্ত, সুতরাং ভ্রূযুগলের প্রান্তদ্বয়, কর্ণমূলের প্রান্তেই অন্তর্হিত হইয়াছে। নয়ন দুইটি যেন শ্বেত ও নীল পদ্মের সমষ্টি; অমৃতময় সরোবরে ভাসিতেছে। দৃষ্টি—অমৃতময়ী, মাধুর্য্যময়ী; চঞ্চল কিম্বা তীক্ষ্ণ নহে, তাহা বলিয়া স্থির কিম্বা কোমলও নহে; উভয় গুণের সাম্যভাব; লজ্জা, প্রেম এবং স্নেহে মাখা; কটাক্ষ কুটীল নহে বরং সরল; এই সরল দৃষ্টিতে শরক্ষেপ হয় না। নাসিকা— সুন্দরীর নাসিকার ন্যায়, দেখিতে আনন্দিত, সুগঠিত, এবং তাহার অগ্রভাগে লোলকের মতি বিলম্বিত, কর্ণ—অস্থূল, আরক্তিম; ঝুমকার ভার বহনে অসমর্থ; অধরোষ্ঠ—আলোহিত, রসাল, কোমল, ঘূরান, ফুলান; এ-রসাল অধরোষ্ঠ, ইহুদিনীর অপেক্ষাও সহস্র গুণে গুণ সম্পন্ন; দন্ত—মুকুতার ন্যায় গোল নহে, কিম্বা কুন্দ কলির ন্যায় সুচালও নহে, অধিক দীর্ঘও নহে, অধিক

ক্ষুদ্রও নহে, এই সকলের সাম্যভাব; গণ্ডদ্বয় বয়সোচিত মাংসল, গোলাল, লোভনীয় এবং দেখিতে মনোহর; চিবুক সর্ব্বতোভাবেই অনিন্দিত; বক্ষস্থল—মনোরম ও মনোভবের বাসগৃহ এবং সদ্গুণ সকলের আবাসস্থান; কুচযুগল—বয়সোচিত, সুনির্ম্মিত, সুসংস্থাপিত, সুগুণ বিশিষ্ট, ঘন, কঠিন, ঈষৎপীনোন্নত, অপূর্ণা যুবতির কুচ, যেমন হওয়া উচিত, তেমনই; পাঠক! আপনি যদি, একবার এই ইন্দু-বালার বক্ষের বসন উম্মুক্ত করিয়া, হৃদয় সরোবরের স্বর্ণ কমল-কোরক দ্বয় দর্শন করিতেন, তবে আপনি মুনি হউন, যোগী হউন, ঋষি হউন, কোন কালেই তাহা ভুলিতে পারিতেন না। পাঠক! আপনি কি কখন কোন অর্দ্ধ বসনা সুন্দরীর উদ্ঘাটিত হৃদয় প্রদেশে, যৌবনের সারধন এবং মনঃ-প্রাণ-বিমোহন-কুচযুগল দর্শন করিয়া, চঞ্চল হৃদয়ের আবেগ পরম্পরায় বিমোহিত হইয়াছেন? যদি হইয়া থাকেন, তবে ইন্দুবালার কুচযুগলের সৌন্দর্য্য কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন। বাহুযুগল মৃণালবৎ সুকোমল; করতল—রক্তোৎপল-বিনিন্দী; অঙ্গুলির তুলনা নাই। কটিদেশ ক্ষীণ বটে; নিতম্বদেশ—বয়সোচিত প্রশস্ত, মাংসল, ঘূরান, ফূলান, চক্রবৎ গোলাকার বলিলেও বলা যায়; যিনি এই তীর্থ-শিলায় বসিয়া ইষ্ট সাধন করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত মনুষ্য; পাদযুগল এবং চরণতল মনোহর; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাংসল এবং গোলাল; ইন্দুবালা, স্থূল, কৃশ, দীর্ঘ কিম্বা খর্ব্বাঙ্গী নহেন এই সকলের সাম্যভাব; স্বর—কোকিল-কণ্ঠ বিনির্গত স্বর সদৃশ সুমধুর; বচন—অমৃতময়; ইচ্ছা করে, ইন্দুবালা দিন যামিনী কথা কহুন আর আমরা শ্রবণ করি, বস্তুতঃ ইন্দুবালার সকলই অলৌকিক প্রীতিপ্রদ;

নগেন্দ্র ইন্দুবালার মুখশশী দর্শন করিতে করিতে, তদ্দিকে গমন করিতেছেন আর বিবেকের কৃপায় এক একবার ভাবিতেছেন, এই পরকীয় ললনারে দর্শন করিয়া আজি কেন আমার অন্তঃকরণ এতাদৃশ বিকার প্রাপ্ত হইল! মন যেন কহিয়া দিতেছে এই শশীমুখী তোমার হৃদয়-

হারিণী ; এ-কি ! আমার হৃদয় কেমন একপ্রকার হইতেছে কেন ? আমি কি এই মনোমোহিনীর অঙ্গ স্পর্শের অযোগ্য হইব ! অপরিচিতা বালিকা ; আমার পক্ষে গরল কি অমৃত ; অগ্নি কি চন্দ্রিকা ; মরীচিকা কি তরঙ্গিণী ; প্রচণ্ড জ্বালা কি ছায়া, তাহা আমি জানি না ; কিন্তু জানি না কি জন্য আজি আমার অন্তঃকরণ, শেষ পক্ষই অবলম্বন করিতেছে। আমি এখন কি করি, এই লোক ললামভূতা-ললনার নিকটে কেহ নাই যে, পরিচয় জিজ্ঞাসা করি ; এই আনন্দদায়িনী কি পরিচয় দানে আমায় কৃতার্থ করিবে ? এই ভাবিতেছেন আর অগ্রসর হইতেছেন। এমন সময়ে ইন্দুবালার প্রিয়সখী বাসন্তী—কিঞ্চিৎ দূর হইতে কহিতে লাগিলেন "পূজ্যতম ক্ষত্রিয় কুল-পাবন জয়ন্ত রাজপুত্রি ইন্দুবালে ! সংসার ললামভূতে সখি ! ইন্দুবালে ! স্থলজ কুসুমে, কমলে কিম্বা বসন্তে, তোমার মনের জ্বালা নিবারণ করিতে পারিবে না, তোমার শিবপূজার ফল যে কত দিনে ফলিবে, তাহাও আমি জানি না, বর বিনে সখীর প্রাণ গেল ; সখি ইন্দুবালে ! বেলা গেল, আর না, এস, আমরা পট-বাসে গমন করি"। মরু ভূমিতে বারি ধারার ন্যায়, বাসন্তীর অমৃত-বর্ষিণী বাণীতে যুবরাজ দেহে জীবন পাইলেন। ঈষৎ হাসিতে হাসিতে গমন করিয়া যুগল করে ইন্দুবালার যুগল কর গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রাণেশ্বরি ! নগেন্দ্রের হৃদয় সরস সরোজিনি ! আজি হইতে এ অধীন এই চরণ যুগলের চিরদাস হইল। আমার মনঃ প্রাণ সুখ সম্পত্তি আজি এই রমণীয় কোমল করপল্লবে অর্পণ করিলাম।

ইন্দুবালা যুবরাজের কন্দর্পদর্পহররূপরাশি দর্শনে পূর্ব্বেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সহজ-শালিনা ভরে কাতরা ইন্দুবালা, একবার মাত্র যুবরাজের মুখচন্দ্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বদন অবনত করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, স্বামিন্ ! হৃদয়েশ্বর ! ইন্দু-বালা আপনার ভিন্ন অন্য কাহারও নহে। প্রকাশ্যে কহিলেন "স্বামিন্ আজি এ-দাসী, এই শ্রীচরণের চিরদাসী হইল" এই বলিয়া পূর্ব্বগ্রথিত

এবং পরিধৃত পদ্মমালা গলদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া যুবরাজের গলদেশে প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। নগেন্দ্রও, নিজ গলদেশ হইতে রত্নহার খুলিয়া ইন্দুবালার গলদেশে প্রদান করিলেন এবং অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মুক্ত করিয়া প্রিয়তমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। ইন্দুবালাও স্বকীয় হীরক-হার, যুবরাজের হৃদয়ে প্রলম্বিত করিয়া দিলেন। এদিকে উভয়ে এইরূপ কার্য্যপরম্পরায় ব্যাপৃত আছেন, অন্যদিকে বাসন্তী পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতেছেন, তথাচ উত্তর নাই। আর কি কর্ণ আছে যে শ্রবণের কার্য্য করিবে! বাসন্তী প্রিয়সখার কোন উত্তর না পাইয়া ত্বরিতপদে সরোবর কূলে আগমন করিয়া এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে অদৃশ্য ভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা হইয়া উভয়ের ভাবগতিক দর্শন করিতে লাগিলেন। আপাদ মস্তক বর্ম্মাচ্ছাদিত, কটিতলে করবাল বিলম্বিত, পূর্ণযৌবনে পরিশোভিত যুবরাজ নগেন্দ্র মূর্ত্তিই, বাসন্তীর বিশেষ মনোহারিণী হইল। না হইবেই বা কেন, নগেন্দ্রের আর সে শৈশবোচিত শরীর, আর সে কান্তি, সে স্বভাব, সে কার্য্য কিছুই নাই। তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। প্রশস্ত ললাটদেশ, আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু, সুসংযুক্ত ভ্রূ-যুগল, সুসঙ্গত সু-গঠিত উন্নত নাসিকা, মনোহরকর্ণ, অনিন্দিত অধরোষ্ঠ, সুদৃঢ় মুক্তাকলাপীকৃত দন্তপংক্তি, নববিকসিত নলিনীদলস্থ অলি-মালার ন্যায় মনোহারিণী গোঁফের রেখা, সুগঠিত কণ্ঠ, জয়লক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমির ন্যায় পাষাণবৎ দুর্ভেদ্য বিশালায়তন বক্ষ; বজ্রসারময় আজানুলম্বিত বাহুযুগল; মূর্ত্তিমান কাঠিন্য কোমলত্ব এবং সার-বত্তার সমষ্টি স্বরূপ যুগপৎ জানু যুগল দর্শন করিলে, বিমোহিত হইতে হয় এবং একত্র বিভিন্নগুণগণের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সহসা শান্তিময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিলে, আনন্দ-নীরে অবগাহন করিতে হয় কিন্তু কিয়ৎক্ষণ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে, মনোমধ্যে প্রভূত ভয়ের সঞ্চার হয়।

বস্তুতঃ এরূপ মধুর অথচ গম্ভীর অবয়ব কখন দর্শন করা যায় নাই, মুখমণ্ডল উৎসাহে পরিপূর্ণ, ভীষণতার আশ্রয়, কঠোরতার আবাস-ভূমি, কোমলতার জন্মস্থান, এবং কাঠিন্যের এক মাত্র অবলম্বন ; অন্তঃকরণে যেন দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, নম্রতা, নির্দ্দয়তা, ভীষণতা, ঔদ্ধত্য, প্রচণ্ডতা মূর্ত্তিমতী হইয়া বাস করিতেছে। প্রকৃতি মত্ততায় পরিপূর্ণ, অহঙ্কারে সমাচ্ছন্ন, অথচ বিনয়ে পরিশোভিত ; সর্ব্বদা বীররসেই মত্ত, বীরচরিত গানেই আসক্ত, এবং বীরকার্য্যেই একান্ত নিরত ; কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে আলস্য নাই। কষ্টে কষ্ট বোধ নাই। বিপদ্‌ভয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলকেই সমানরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। এরূপ মহাপুরুষ, কেনই বা বাসন্তীকে বিমুগ্ধ করিবেন না।

নগেন্দ্র, ইন্দুবালাকে নিকটে সরাইয়া আনিলেন। ইন্দুবালা, প্রিয়তমের সম্মুখভাগে নিজ পশ্চাদ্ভাগ সংযুক্ত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যুবরাজ চোরের ন্যায় একবার সচকিতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া ইন্দুবালার দুই কক্ষের মধ্যদিয়া, দুই হস্ত প্রবিষ্ট করাইলেন এবং স্বর্ণ বল্লরীর, হৃদয়স্থ স্বর্ণ ফলদ্বয়, কর-পল্লবে সমাচ্ছাদিত পূর্ব্বক, আলোহিত অধরোষ্ঠে আলোহিত অধরোষ্ঠ সম্মিলিত করিয়া অমৃতস্বাদ অনুভব করিলেন। নবীন দম্পতী আজি নবীন রসপানে বিভোর ; আজি হৃদয়ে হৃদয়ে, জীবনে জীবনে, প্রেমে প্রেমে, যত্নে যত্নে, মমতায় মমতায়, বিনিময় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। দেখিয়া বাসন্তীর অধরে আর হাসি ধরিল না। মিটি মিটি মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, আজি সখী আমার সর্ব্বস্ব হারাইলেন, মনঃপ্রাণ জীবন যৌবন আজি সরোবরকূলে বিসর্জ্জন দিলেন। আজি স্বাধীনতায় স্বইচ্ছায় বিদায় দিলেন। জানি না, আজি মহানদী কিরূপ আধারে পতিত হইলেন। আকৃতি যদি অবস্থার পরিচায়ক হয়, তবে ইনি নিশ্চয়ই মহাসমুদ্র, তাহাতে সংশয় নাই। এই যুবক ত, আজি সখীর সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এখন সখীর উপায় !

পরিচয় না লইলে সখীর কি হইবে !! সখীর এ-সুখের সময়ে কেমন করিয়াইবা বাধা প্রদান করি, রমণী হইয়া কেমন করিয়াইবা এসুখ-ভঙ্গ করি, আমা হইতে তাহা হইবে না। এ-সুখ তরঙ্গের শেষ সীমা না দেখিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক পরিচারিণী আসিয়া সংবাদ দিল, দেবি বাসন্তি ! রাজবালা কোথায় ? বৃদ্ধ মহিষী আহ্বান করিতেছেন, বাটী যাইবার সময় হইল, শীঘ্র আগমন করুন। বাসন্তী কহিলেন, তুমি প্রতি-নিবৃত্ত হও আমরা যাইতেছি। সে চলিয়া গেল। তৎপরে বাসন্তী, সখি ইন্দুবালে ! সখি ইন্দুবালে ! বলিয়া মধুর স্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইন্দুবালার চমক হইল, কহিলেন স্বামিন্ ! ছাড়িয়া দেন, সখী বাসন্তী আসিতেছেন। যুবরাজ দারুণ অনিচ্ছায় প্রিয়তমাকে ছাড়িয়া দিলেন। ছাড়িব না, মনে করিলেও ছাড়িয়া দিলেন। হৃদয় ব্যাকুল হইলেও প্রিয়ার কথায় ছাড়িয়া দিলেন। বাসন্তী আহ্বান করিতে করিতে নিকটে আগমন করিয়া কহিলেন—সখি !

"দেখে মন আর প্রাণ যুড়াল।
হর পূজে বর মিল্‌লো ভাল ॥"

এই যে মাল্য আদান প্রদান পর্য্যন্ত শেষ করিয়াছ। চিরসঙ্গিনী বাসন্তীকে দেখে এমন চাঁদমুখখানিকে লজ্জা মাখা করিলে কেন ? আজি হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময় করিয়া কি, এই নূতন হৃদয়ের নূতন লজ্জা আমায় দেখাইতেছ ? মহাভাগ ! আপনি আমার সখীকে হস্তগত করিয়া কি, সরল ভাব সকলকেও আয়ত্ত করিয়াছেন। আয়ুষ্মন্ ! ভবিতব্য আপনাদিগের মঙ্গল করুন। দেব ! আপনি কোন্ বংশ পবিত্র করিয়াছেন, জানিতে বড়ই বাসনা হইতেছে। ইন্দুবালা সখীর প্রশ্ন শ্রবণে যুবরাজ দত্ত অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। বাসন্তী পাঠ করিয়া কহিলেন, মহাভাগ ! আপনি কিরাতরাজ পুত্র নগেন্দ্র, সখীর

আমার কি পরম সৌভাগ্য ; আপনি কে—এক্ষণে তাহা জানিলাম, আপনি, পরম ধার্ম্মিক রাজাধিরাজ সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী হংসকেতু পুত্র যুবরাজ নগেন্দ্র, চরণে প্রণত হই, অধীনীর অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।

যুবরাজ কহিলেন, ক্ষমা করিতে পারি, যদি তোমার সখী এই রত্নহারটি পরাইতে দেন। বাসন্তী বলিলেন, তাহাতে কি লাভ হইবে? যুবরাজ কহিলেন, আর একবার মুখখানি দেখিতে পাইব। বাসন্তী বলিলেন, দর্শনের পিপাসা কি শান্তি হয় নাই? যুবরাজ কহিলেন, দেহে প্রাণ থাকিতে হইবে না। বাসন্তী বলিলেন, যুবরাজ! দর্শন, স্পর্শন, আলিঙ্গন এ-তিন হইতে, আমার সখী কি আপনায় বঞ্চিত রাখিয়াছেন? না—আপনিই সখীকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন? তবে সে বিষয়ের অনুমতির অপেক্ষা কি? যুবরাজ কহিলেন, যদি অপেক্ষা না থাকে তবে আমি একবার স্বহস্তে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিব। ইন্দুবালা কহিলেন, সখি! আমি আর পারিব না, ক্ষান্ত হইতে বল। বাসন্তী বলিলেন—

পারিবে না কেন, পারিতেই হবে না পারিলে কেবা ছাড়ে।
জাননা ললনে! সুভোগ পাইলে ভোগের বাসনা বাড়ে॥
তব মুখ সুধা পিয়ে বৃদ্ধি ক্ষুধা হ'য়েছে নাথের তোর।
সহজে স্বীকৃত না হ'লে ললনে! খাইবে করিয়া জোর॥
(এমন) নব বিকশিত কনকনলিনী নূতন মধুতে ভরা।
পাইলে মধুপ, না ছাড়ে কখন এমনি আছে লো ধরা॥

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে ইন্দুবালার অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া হস্তদ্বয়ে মুখচন্দ্র ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, আয়ুষ্মন্! এইবার আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিতে পারেন। ইন্দুবালা বলপূর্ব্বক বদন ছাড়াইয়া লইয়া সখীকে প্রণয় প্রহার করিলেন। পরে বাসন্তী কহিলেন, দেব!

অনুমতি হয় ত আমরা গমন করি। যুবরাজ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আমার উপায় ? বাসন্তী কহিলেন, বাসন্তী থাকিতে চিন্তা কি ? আমরা হিমপুরীতে গমন করিলে পর, যাহাতে শীঘ্র আপনাদের সম্মিলন হয় তাহা করিব। প্রার্থনা এই আপনি আমাদের সখীকে বিস্মৃত হইবেন না। যুবরাজ কহিলেন, যদি আত্মাকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয়, তথাচ তোমার সখীকে ভুলিতে পারিব না। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে এক অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ যুবরাজের অনুসন্ধানে আসিয়া পথপ্রান্তে তাঁহার প্রসিদ্ধ ঘোটক দর্শনে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে সরোবরকূলে আসিয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক যুবরাজ চরণে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল, যুবরাজ ! আপনার জননী—স্বর্গীয় কিরাতরাজমহিষী, অসুস্থ হইয়া আপনার দর্শন কামনা করিতেছেন, কি আজ্ঞা হয়। নগেন্দ্র শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সেনাপতে ! জননী আমার এক্ষণে কেমন আছেন ? পীড়ার সংবাদে প্রাণ যে কেমন করিয়া উঠিল। আমি যাইতেছি, তুমি গমন কর। সৈনিক যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। পরে নগেন্দ্র কহিলেন, সখি বাসন্তি ! আর আমি বিলম্ব করিতে অক্ষম ; আমার মনঃপ্রাণ তোমার নিকটে গচ্ছিত থাকিল, সাবধানে রক্ষা করিও। এই বলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে প্রিয়তমার বদন নিরীক্ষণ করিয়া করগ্রহণ পূর্ব্বক হৃদয়েশ্বরি ! কোন চিন্তা করিও না, তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকিলে, এই কথা বলিয়া হস্তত্যাগ করিয়া ঘোটকের নিকটে গমন করিলেন। বাসন্তী, ইন্দুবালার মুখপানে চাহিয়া দেখেন রোদন করিতেছেন। প্রিয়সখী অঞ্চল দ্বারা মুখ মুছাইয়া কহিলেন, ছি সখি ! রোদন করিতে নাই, এস আমরা গমন করি। ইন্দুবালা কহিলেন, চল। চল— বলিয়া যুবরাজের অনুগামিনী হইলেন। বাসন্তী কহিলেন, সখী ওদিকে নয় এ-দিকে আইস। যুবরাজ পশ্চাদ্ভাগে অবলোকন করিয়া দেখেন— ইন্দুবালা আসিতেছেন, গমনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া প্রিয়তমার নিকটে

আসিলেন, হৃদয় কেমন করিয়া উঠিল, সাদরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—

হৃদয়-সরসে মম জীবন-জীবনে।
বিকশিতা কমলিনী তুমি লো ললনে॥
সুখ-সূর্য্য সদা করি কর বরিষণ।
রাখিবে প্রফুল্ল তোমা, প্রতিজ্ঞা বচন॥
সত্য সত্য পুনঃ সত্য সাক্ষী দিনমণি।
তুমি মম প্রিয়তমা হৃদয়ের মণি॥
তব মুখ-সুধাপানে মন-মধুকর।
প্রমত্ত হইয়া গুণ গায় নিরন্তর॥
তোমারে কি ভুলিবারে পারি ওলো সতি!
চকোরী বিহনে কোথা চকোরের গতি॥
মাতৃ দরশন পরে, তোমা দরশনে।
যাইব যাইব প্রিয়ে! যাওলো ভবনে॥

বাসন্তী আসিয়া ইন্দুবালাকে জড়াইয়া ধরিল। যুবরাজ পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মাতৃ-দর্শনে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। বাসন্তী ইন্দুবালাকে লইয়া বস্ত্রাবাসে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে ইন্দুবালা কহিলেন, সখি! এ সকল সংবাদ "আমার মাথা খাও" আমার দিব্য এখন পিতামহী মহাশয়াকে শ্রবণ করাইও না। বাসন্তী কহিলেন, ভাল; আমি তোমার অবাধ্য নহি। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন।

ইন্দুবালা।

বৃদ্ধা জয়ন্তরাজ-জননী, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দাসদাসী সৈন্য সঙ্গে লইয়া তীর্থদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, অত্যন্ত ভালবাসা নিবন্ধন ইন্দুবালাও সঙ্গে আগমন করেন। প্রতিগমন কালে এই চতুষ্পথ প্রান্তে বিশ্রাম জন্য অবস্থান করিলে ইন্দুবালার সহিত যুবরাজের সহিত মিলন ঘটে। ইন্দুবালা উপস্থিত হইলে রাজজননী গমনের অনুমতি দিয়া কহিলেন, চন্দ্রসরঃ তীর্থে গমন কর। তথায় মাসেক অবস্থানের পর গমন করিব। প্রবাদ আছে চন্দ্রসরঃ তীর্থে এক মাস অবস্থান করিয়া স্নান পূজা দানাদি করিলে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। মহাদেবী তন্নিমিত্ত তথায় গমনের অনুমতি দিলেন এবং কয়েক দিনের পরেই তথায় উপস্থিত হইয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেন।

এ-দিকে ইন্দুবালা যুবরাজের বিরহে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। শয়ন, ভোজন, উপবেশন ভ্রমণ কিছুতেই সুখ নাই। সতত অন্য মনস্ক, চিন্তিত এবং উদ্ভ্রান্ত; কোন বিষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেও শুনিতে পান না। ব্যবহার্য্য প্রিয়বস্তু সকল কোথাও পড়িয়া থাকিলে, তাহাতে যত্ন নাই। বাসন্তী দেখিয়া শুনিয়া ভীত হইলেন, ভাবিলেন সখীর এ-ব্যাধি দিনে দিনে বলবান্ হইতে চলিল, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। এই ভাবিতে ভাবিতে নিকটে গিয়া কহিলেন সখি!—

বালিকা বয়সে রসের সাগরে, ভাসায়ে প্রেমের তরী।
সখি! সোণার বরণ কালিমা করিলি ভাবি দিবা-বিভাবরী॥
ভেবে তব ভাব ভাবনা-সাগরে ডুবিল আমার মন।
ধৈরজ ধরলো পরাণ পুতলি পাইবি পরাণ ধন॥
তব এই দশা নয়নে নিরখি পরাণ বিদরি যায়।
বালিকা বয়সে নবীন লতিকা শুকাল বজর ঘায়॥

ইন্দুবালা। বিনা যুবরাজ হৃদয় আমার,
কেমন কেমন করেলো ধনি !।
উহুঃ মরি ! মরি ! প্রাণ সহচরী
কখন দেখিব হৃদয় মণি ॥
দেখিতে আমারে আসিবে প্রাণেশ,
বলিয়া প্রবোধি গেলেন চলি।
বুঝি কোন ফুল্ল, কুসুম পাইয়া,
আমারে ভুলিয়া গেছেন অলি ॥
সেই সরোবর সেই সে সময়,
সেই সেই সব ঘটনা গুলি।
সেই প্রাণনাথ সেই সে বচন
সেই সব কাজ কেমনে ভুলি ॥
শুইলে স্বপনে প্রাণনাথ আসি,
হাসি হাসি মুখে ভুলায় মোরে।
ধরিব ধরিব মনেতে করিলো,
পারি না ধরিতে ঘুমের ঘোরে ॥
যুবরাজ ধ্যান যুবরাজ জ্ঞান
বাঁচি না সখি লো ! সে ধন বিনে।
সব তমোময় নাহি দেখি কারে
কেহ নাহি যেন ভুবন তিনে ॥

বাসন্তী কহিলেন, সখি ! বলিতে বলিতে রোদন করিয়া ফেলিলে ; ধৈর্য্য ধর, শান্ত হও আমি বৃদ্ধ মহাদেবীকে বলিয়া উপায়াবধারণ করি। ইন্দুবালা কহিলেন সখি ! তোমার পায়ে পড়ি, ও-কথা মুখে আনিও না। অগত্যা বাসন্তী ক্ষান্ত থাকিল। এক দিন রাত্রি শেষে

ইন্দুবালা স্বপ্নে দর্শন করিলেন যেন যুবরাজ নগেন্দ্র কহিতেছেন "প্রিয়ে ইন্দুবালে! প্রাণ যায় আসিয়া দর্শন দাও, তোমার অদর্শনে এই সরোবরকূলে হতভাগ্য নগেন্দ্রের প্রাণ যায়, আসিয়া রক্ষা কর। মনঃপ্রাণ শীতল কর। একবার শশীমুখে মধুরহাসি হাসিয়া বাক্য-সুধাদানে আমায় বাঁচাও। ভয়ানক স্বপ্নে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, গাত্রোত্থান করিলেন, নিকটে বাসন্তীকে নিদ্রিত দেখিলেন। নিঃশব্দে বাহিরে আসিলেন। অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। তৎপরে সুযোগক্রমে প্রচ্ছন্নবেশে প্রিয়পতির উদ্দেশে সেই স্থানে গমন করিলেন। দেখিতে দেখিতে বহুদূর গমন করিলেন। কিন্তু পথভ্রান্ত হইয়া বিপথে পতিত হইলেন। এ-দিকে বৃদ্ধ মহিষী, যখন কাতর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন বাসন্তী সকল কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধা-মহিষী শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ সমুদ্রে ভাসমান হইলেন কিন্তু ইন্দু-বালার অভাবে দশদিক্ শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে কিরাতরাজ্যে অশ্বারোহী প্রেরিত হইল।

এ-দিকে ইন্দুবালা প্রিয়পতির অন্বেষণে যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিলেন। যাহারা সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা লোক-ললামভূতা কামিনীকে দর্শন করিতে লাগিল, তাহারাই বিস্ময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। রূপে দশদিক্ আলো করিয়া যাইতেছেন। নব যৌবনে মুনির মন টলাইতেছেন। গমনে রাজহংসীকে লজ্জা দিতেছেন। চরণ বিক্ষেপে যুবকগণকে দগ্ধ কি বিগলিত, উদ্ভ্রান্ত কি প্রমত্ত, বিচূর্ণিত কি বিঘূর্ণিত, কি যে করিতেছেন, তাহা তাহারা অবধারণে অসমর্থ; সকলেই মনের আবেগে অস্থির; প্রত্যেকেই লাভ লালসায় প্রমত্ত; কত জনে সাদর সম্ভাষণে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, কোন উত্তর নাই, যথেচ্ছ গমন করিতেছেন। কাহারও এমন সাহস হইতেছে না যে, বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য সম্পন্ন করে। কয়েক দিনের পর এক স্থানে কতকগুলি প্রবীণ, ইন্দুবালাকে সমাদরে পথমধ্যে স্থির করিয়া মধুর সম্ভাষে

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এমন সময় তথায় সরোজবাসিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ শরীরধারিণী শঙ্করী-সদৃশী সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া সকলে তচ্চরণে প্রণত হইলেন। এই সময়, ইন্দু-বালা কহিলেন—

আমি অভাগিনী, পতি বিরহিণী,
নগেন্দ্র রমণী হই।
জয়ন্ত-নন্দিনী, রাজার কামিনী,
তোমা সবাকারে কই॥
নগেন্দ্র চরণ, বিনা দরশন,
অপর মানস নাই।
ত্যজি ভয় লাজে, সেই যুবরাজে,
শরণ লইতে যাই॥

সরোজবাসিনী শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মা! তুমি কি জয়ন্তরাজ-পুত্রী ইন্দুবালা? হাঁ মা! আমার নাম ইন্দুবালা; তুমি প্রিয়পুত্র যুবরাজ নগেন্দ্রের মানস-মানসসর-রাজহংসী? হাঁ জননী আমি তাঁহার অনুগৃহীতা সহধর্ম্মিণী; সরোজবাসিনী শ্রবণ করিয়া আনন্দ সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে ইন্দুবালাকে ক্রোড়ে লইয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন। সকলে বিস্মিত এবং চকিত হইয়া চাহিয়া রহিল। প্রবীণের মধ্যে এক ব্যক্তি সরোজবাসিনীর বৃত্তান্ত জানিতেন। তিনি তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনে সকলকে শান্ত করিলেন।

এ-দিকে যুবরাজ নগেন্দ্র রাজধানীতে আগমন করিয়া মাতা নবীনকালীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার পীড়া শান্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ঈশ্বর কৃপায় নবীনকালী অল্প দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন। নগেন্দ্র, জননীর পীড়ায় চিন্তিত থাকিলেও ইন্দুবালাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এক্ষণে হৃদয়-সরসের-

সরোজিনী ইন্দুবালাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। প্রিয়ার সেই মুখেন্দু, সেই হাসি, সেই হাবভাব, সেই অবস্থা যুবরাজকে বিষম বিচলিত করিয়া তুলিল। ভোজনে, উপবেশনে, শয়নে কিছুতেই সুখ নাই, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, উৎকণ্ঠিত এবং চিন্তিত; প্রিয়ার বিরহে নগেন্দ্র দিন দিন কেমন এক প্রকার হইতে লাগিলেন।

মৃত কিরাতরাজ, যদুপতি নামে এক নিরাশ্রয় বালককে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি এই রাজসংসারেই বাস করেন। স্বর্গীয় মহারাজ তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের সমস্ত সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী র নাম মাধবী; নগেন্দ্র উভয়কে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিয়া থাকেন। বিশেষ মাধবীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। অধিক কি মাধবী স্বহস্তে ভোজ্যাদি প্রদান না করিলে নগেন্দ্রের পান ভোজনে পরিতৃপ্তি জন্মে না। নগেন্দ্র, মাধবীকে স্নেহ-চক্ষে ভগিনীর ন্যায়, প্রণয়-চক্ষে প্রিয়বস্তুর ন্যায়, ধর্ম্মজ্ঞানে গুরুপত্নীর ন্যায়, সাংসারিক জ্ঞানে প্রিয় সখীর ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন। মাধবী এবং নগেন্দ্র একত্রিত হইলেই উভয়ে এমন নিঃশঙ্কভাবে আলাপ করেন যে, অন্তরাল হইতে তাহা শ্রবণ করিলে দম্পতীর আলাপের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের কেহ কাহাকে কখন পাপ-নয়নে দর্শন করেন নাই।

মাধবী যুবরাজের ভাবগতিক দর্শন করিয়া তাহার কারণ এক প্রকার অবধারণ করিলেন। চতুরা যুবতী রমণী, পুরুষের অবস্থাপরিজ্ঞানে বিশেষ সমর্থ; তবে পূর্ণ যৌবনা মাধবী তাহাতে সুপণ্ডিতা না হইবেন কেন? তিনি এক দিন নগেন্দ্রকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন, আয়ুষ্মন্! এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন? নগেন্দ্র কহিলেন, তোমাকে দেখিতে না পাইয়া। মাধবী বলিলেন, আমি ত আপনার নিকটেই আছি। নগেন্দ্র কহিলেন, এতক্ষণ ত ছিলে না। মাধবী বলিলেন, আজি বলিয়া নহে, অদ্য কয়েক দিনই ত এইরূপ দেখিতেছি। এ-চিন্তা

কখনই মাধবীর জন্য নহে, ইহার ভিতর যেন অন্য কেহ আছে। নগেন্দ্র কহিলেন, কে-আছে আন্দাজ কর দেখি। মাধবী বলিলেন, আন্দাজে কখন রোগ ধরা যায় না। লক্ষণেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আপনার যে লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে আন্দাজের আবশ্যক নাই। নগেন্দ্র কহিলেন, কি রোগ বোধ হয়? মাধবী বলিলেন, বিরহ; নগেন্দ্র কহিলেন, কাহার? মাধবী বলিলেন, যে যাহাকে ভাল বাসে তাহার। নগেন্দ্র কহিলেন মাধবি! আমি ত সর্ব্বাপেক্ষা তোমাকেই অধিক ভাল বাসি।

মাধবী। হায়! কি কালের গতি, না যায় বর্ণন।
সেই ভাল বাসা অন্যে করিল হরণ॥
তব—হৃদে স্থান লাভ করেছে যে বালা।
সে বিনে মাধবী নারে নিভাতে এজ্বালা॥

নগেন্দ্র। প্রিয়ার নামের অর্দ্ধ করি উচ্চারণ।
করিলে আমার কর্ণে সুধা বরিষণ॥

মাধবী বলিলেন, যুবরাজ! নামার্দ্ধ কি বলিলাম? কেবল ত বালা শব্দ উচ্চারণ করিয়াছি। গিরিবালা, শৈলবালা, ব্রজবালা, রাজবালা, ইহার মধ্যে কোন বালা আপনার হৃদয় আলা করিয়া বিরাজ করিতেছেন?

যুবরাজ। সখি! তবে শুনিবে শোন—
ইন্দুবালা নামে জয়ন্ত দুহিতা
রূপে অনুপমা সরলা বালা।
দিবস যামিনী সে নব নলিনী
র'য়েছে এ-হৃদি করিয়া আলা॥
মরি কি গঠন! নবীন যৌবন
তাহার উপরে দিয়াছে শোভা।

হাসিভরা মুখ মরি কি বাহার !
হাব ভাব কিবা মানস লোভা।
মরি কি বচন অমৃতে মাখান
শ্রবণে শ্রবণ শীতল করে।
বসন্ত কোকিল কূজন বিনিন্দি
সে বচনে ধনী মানস হরে ॥
নবীন বয়স নবীন যৌবন ;
নবীন নয়নে কটাক্ষ ঘটা।
নবীন নীরদ কোলেতে যেন হে
নরমে খেলিছে বিজলী ছটা ॥
মুখসুধাকরে কিবা শোভা ধরে,
অতুল অধর অমৃত খনি।
পান করি যাহা দ্বিগুণ পিপাসা
বাড়িয়া আমার গিয়াছে ধনি ! ॥
ছোট ছোট দুটি কমল-কোরক
সে হৃদি সরসে দেখিতে যদি।
তুমিও সাধ্বী যাইতে ভুলিয়া
বলিতে সাবাস্ সাবাস্ বিধি ॥
কিবা সে নিতম্ব মানস-মোহন
যেমন বয়স তেমনি শোভা।
আমি কোন্ ছার্ না ভুলিব কেন
যোগীজন-কুল মানস লোভা ॥
আর কত দিনে হেরিব তাহারে,
কবে সে সুদিন প্রভাত হবে।

জান ত মাধবী বল না বল না
সে দিন প্রভাত হইবে কবে ?॥

মাধবী। শুনিয়া বচন, মানস রঞ্জন,
বিমোহিত মন হইল মোর।
ধন্য সেই ধনী, নারী শিরোমণি,
ধন্য সে রমণী, হৃদয় চোর॥
তোমার মানস, যে ক'রেছে বস,
তাহারে সরস বলিয়া মানি।
যেহেতু তোমার, এরূপ সম্ভার
শোভার আধার, সবাই জানি॥
যে হয় মোহন, ভুবন রঞ্জন,
তাহারে যে জন, ভুলায় রূপে !
সরস্ সরস্, সে ধনী সরস
দেখিতে মানস, দেখি কিরূপে ? ॥
নূতন অধরে, নূতন অমৃত
নবীন যুবক, করিয়া পান।
প্রেমে ডগমগ হইয়া, সুতানে
মনের আবেগে ধ'রেছে গান॥
রমণী রমণে প্রেম আলিঙ্গনে,
সে সুখ মিলনে কি সুখোদয়।
জানে না সে জন, যে জন কখন,
রমণী রতনে বঞ্চিত রয়॥

মহাভাগ ! এক্ষণে প্রার্থনা এই রাজলক্ষ্মীকে গৃহে আনিতে তবে আর বিলম্ব কেন ? মাকে বলিয়া পরিণয় দিন নিশ্চয় করিলে ভাল

হয় না? তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতেছে; যুবরাজ কহিলেন, স্থির হও, ব্যস্ত হইলে কার্য্য হয় না। ইন্দু আসিলেই ত তোমার কার্য্যের ব্যাঘাত? মাধবী কহিলেন, কার্য্য বন্ধ হইলে আপনাকে চিন্তা করিবার অনেক সময় পাইব। এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাধবী যুবরাজকে হাসাইলেন। তৎপরে উভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

উপসংহার।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সরোজবাসিনী ইন্দুবালাকে গ্রহণ করিয়া, সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে দাক্ষায়ণী তীর্থে উপস্থিত হইয়া দেখেন তাঁহার দুই তিনটি প্রিয়শিষ্যা তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আগমন অপেক্ষায় উৎসুকচিত্তে কালযাপন করিতেছেন। সরোজবাসিনী সকলকে সাদর সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া ইন্দুবালার পরিচয় দিয়া দিলেন। সকলে বালিকা ইন্দুবালার অসামান্য প্রণয় ও পতিভক্তি দর্শনে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া সহাস্য হাস্যে পরস্পরে অঙ্কে ধারণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। পশ্চাৎ সরোজবাসিনী কৃতস্নানা হইয়া দাক্ষায়ণীর পূজায় বসিলেন। মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির মধ্যে স্থাপিত দাক্ষায়ণী এক শক্তিমূর্ত্তি; নানাদিগ্‌দেশাগত বহুবিধ ব্যক্তি আগমন করিয়া প্রতিদিন এই জগত্তারিণীর পূজা করিয়া থাকে। মন্দিরের সম্মুখভাগে অসংখ্য স্তম্ভে সুশোভিত লাটবাঙ্গালা, তন্মধ্যে অসংখ্য উদ[illegible] হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। দেবীগৃহের অপর তিনদিকে সেই চরণ দর্শন নানাবিধ বিকসিত কুসুম নিকরে অলঙ্কৃত হইয়া মনোনয়ে সেই চরণ সম্পাদন করিতেছে। এই তীর্থস্থানের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সৌধ বিমরস-হেম- থাকিয়া আগন্তুকগণের অবস্থানের ক্লেশ নিবারণ করিতেছে। ধূপ দেখিব।

গন্ধ বিবিধ কুসুমের গন্ধ, আহুতির গন্ধ নানাবিধ গন্ধে দেবীগৃহ সর্ব্বদা সুবাসিত থাকে; উদাসীনের বেদধ্বনি, দর্শনার্থীদিগের আনন্দধ্বনি ব্যক্তি-বৃন্দের কথোপকথনের সম্মিলিত অব্যক্ত ধ্বনি, বিবিধ ধ্বনিতে তীর্থ-স্থান নিরন্তর প্রতিধ্বনিত; অনেক উদাসীনই সরোজবাসিনীর তপঃ-প্রভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। সময়ে সময়ে অনেক গার্হস্থ্যও তাহার মহীয়সী শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। অপর—যেসকল লোক একবার সরোজবাসিনীর সেই চিত্ত-হারিণী মূর্ত্তি দর্শন করিত, তাহারাই তাঁহাকে সাক্ষাৎ শরীরধারিণী শঙ্করী জ্ঞানে প্রগাঢ় ভক্তি না দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। সরোজবাসিনী পূজাদি সম্পন্ন করিয়া বাহিরে আসিলেন। পার্শ্বস্থ এক প্রশস্ত গৃহে উপবিষ্ট হইয়া ইন্দুবালাকে "কনক-নলিনীর" উপাখ্যান শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। পরে কথা-বন্দ রাখিয়া একখানি পত্র লিখিয়া প্রিয়শিষ্যা মুক্তকেশীকে কিরাতরাজ্যে নগেন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তদনন্তর সরোজবাসিনী কয়েক দিনের মধ্যেই "কনকনলিনীর" উপাখ্যান শেষ করিয়া কহিলেন, ইন্দু-বালে! তোমার শ্বশ্রূদেবীরা এই উপাখ্যান শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বহুযত্ন করিয়াছিলেন। সময়াভাব জন্য আমি তাঁহাদিগের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারি নাই। আর যে পারিব, তাহারও প্রত্যাশা নাই। তুমি তাঁহাদিগের সমক্ষে ইহা কীর্ত্তন করিয়া আমার আজ্ঞা রক্ষা করিও। তুমি পতিব্রতা বিদুষী; উপযুক্ত পাত্রীতেই আমার এ-ভার ন্যস্ত থাকিল। ইন্দুবালা যে আজ্ঞা বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া স্বীকার করিলেন।

একদিন সরোজবাসিনী স্বহস্তে ইন্দুবালার কেশবন্ধন করিয়া দিয়া [illegible]— বহুমূল্য মণিময়-ভূষণ রাশি, ভিক্ষার ঝুলিহইতে বাহির ...রা ইন্দুবালাকে মনের মত করিয়া সাজাইলেন, বারাণসী ...রিধান করাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে লইয়া দেবী মন্দিরে গমন ম...। তত্রস্থ প্রধান পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, অদ্য আর...রে বহিরাগমনকাল পর্য্যন্ত মন্দির মধ্যে যেন কেহ আগমন না

করে। পুরোহিত সরোজবাসিনীর বিষয় অনেক জানিতেন, তিনি যে আজ্ঞা বলিয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেন। বলা বাহুল্য, এই তীর্থ নগেন্দ্রের অধিকারে স্থাপিত।

সরোজবাসিনী দেবীপূজা করিতে করিতে সহসা পুলকিত কলেবর হইয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ শিবে! আজি আমার অন্তঃকরণ এতাদৃশ আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতেছে কেন? যে সুখ আমি কখন স্বপ্নেও ভোগ করি নাই, অদ্য সেই অননুভূত পূর্ব্বসুখে সুখিনী হইতেছি কেন? অদ্য এই দুর্গতিনাশী-চরণ-শশী দর্শনের ফল যে কিরূপ ফলিবে তাহা জানিয়াও যেন জানিতে পারিতেছি না। একবার মনে হইতেছে, আরাধ্য দেবতা কমলাকান্ত আজি আমায় দেখা দিবেন, আজি আমি আমার সাধনের ধন সেই মোক্ষদ চরণ দর্শন করিয়া নয়নের সফলতা লাভ করিব। আজি আমি পতি দর্শনে পাপ দেহকে পবিত্র করিব। আজি আমি, হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, প্রিয়পতিকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইব। আজি আমি আমার বিবাহ রাত্র লব্ধ পরমধনে ধনশালিনী হইব। পতি দর্শন, নারীর মোক্ষফল; মনে হইতেছে আজি যেন আমি সেই ফলে ফলবতী হইব। পতিপদে প্রণাম করিয়া হাস্য মুখে সম্মুখবর্ত্তিনী হওয়া, প্রাণ-পতির করগ্রহণ করিয়া সাদরে অনাময় জিজ্ঞাসা করা, আদরে শয়ন ভবনে লইয়া গিয়া আসনে বসাইয়া পান ভোজন সেবাদিদ্বারা সুশীতল করা, হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া হাসিমুখে কথোপকথনে প্রেমতরঙ্গে সাঁতার দেওয়া, পরম সতীর শুভাদৃষ্টে ঘটে; আমার ন্যায় হতভাগিনী কি আজি সেই সুখে সুখিনী হইবে? মা-দুর্গে! আমি সে দুরাশা কখন করি না। আমি কেবল চরণ-দর্শনের ভিখারিণী; আর একবারমাত্র সেই চরণ দর্শন করিব। বিবাহ রাত্রে একবার দেখিয়াছি আর একবার সেই চরণ দেখিব। মাতঃ শিবে! সর্ব্বমঙ্গলে! আশুতোষ হৃদয়-সরস-হেম-নলিনী! ভিক্ষা এই, এ-জন্মের মত আর একবার সেই চরণ দেখিব।

শুনিয়াছি—স্বামী আমার জন্য সন্ন্যাসী; দাসীর জন্য সন্ন্যাসী হইবার আবশ্যক কি? এ দাসী যে তাঁহার সন্দেহের পাত্রী; এ দাসী যে তাঁহার পবিত্রান্তঃকরণকে আবিল করিবার হেতুভূতা; হায়! "আমি কলঙ্কিনী" এবাক্যও পতিহৃদয়ে স্থান পাইল! আমার নারী জন্মে ধিক্; জননি অভয়ে! যদি আমি তাঁহার চরণ ভিন্ন অন্য কিছুই না জানি, যদি তিনি একমাত্র এই হৃদয়ের অধীশ্বর হয়েন, তবে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে দেখাইব, আমার সতীত্ব পবিত্রাবস্থায় আছে কি না। আমার এ-দেহ, তাঁহার উপভোগের পবিত্র উপভোগ্য বস্তু কি না! স্বামী, স্ত্রীলোকের পরম দেবতা; যে রমণী, বসনভূষণ লাভ করিয়া কিম্বা লাভ করিব মনে করিয়া স্বামী প্রতি ভক্তি দেখায় সে পাতকিনী, সে রমণী রমণী-কুল-কলঙ্কিনী; রাজভোগ, ফলমূল, স্বর্ণপর্য্যাঙ্ক, তরুতল, বারাণসী শাটী, বল্কল, সতীর পক্ষে সকলই সমান; মাতঃ উমে! প্রার্থনা এই অন্নাভাবে শীর্ণ হইয়া, জীবনই বা যাউক, সংসার চক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া দেহ মন বিচূর্ণিতই বা হউক, দ্বাদশ তপন উদয় হইয়া প্রচণ্ডজ্বালায় ভস্মীভূতই বা করুক, অকথ্য ঘোরতর যন্ত্রণায় পতিত হইয়া অন্ধতমসাবৃত সপ্তপাতালতলে গমন বা করুক, তথাচ যেন রমণীকুল পতিপদ পরিত্যাগ না করে। দেব! স্বামিন্! কমলাকান্ত! প্রাণকান্ত! একবার এই সময় আসিয়া এ-হৃদিপদ্মে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিয়া দেহ মন পবিত্র করুন। আমি পদ্মে পদ্মে মিলন দেখিয়া সুখিনী হই। এই বলিয়া আবার পূজায় বসিলেন। ক্ষণকাল পরে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ইন্দুবালে! আমার পুত্রকল্প নগেন্ আগত প্রায়—

একদিন নগেন্দ্র সিংহাসনে আসীন হইয়া, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে মুক্তকেশী আসিয়া সরোজবাসিনী নামাঙ্কিত পত্রিকা যুবরাজের হস্তে প্রদান করিলেন। যুবরাজ পত্রদর্শনে পুলকিত হইয়া তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন। আনন্দে অন্তঃকরণ নৃত্য করিতে লাগিল। সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন। আগমন করিয়া মুক্তকেশীকে

প্রণাম করিয়া বসিতে স্বহস্তে আসন প্রদান করিলেন এবং আগ্রহের সহিত অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুক্তকেশী কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া পত্রপাঠ করিতে কহিলেন। নগেন্দ্র পাঠ করিতে লাগিলেন। "প্রিয়পুত্র নগেন্দ্র! একবার তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করিব নিতান্ত ইচ্ছা, আমি সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী; সুখ সম্ভোগে, গার্হস্থ্য প্রেমে, বন্ধুতায় জলাঞ্জলি দিয়াও জানি না কিজন্য আবার আমি ঘোর মায়ায় বিমোহিত হইয়াছি। নগেন্ একবার দুঃখিনী সন্ন্যাসিনী জননীকল্পাকে দর্শন দিয়া আনন্দিত কর। তুমি আসিলে আমি সুখিনী হইব; দেবী-দর্শন জনিত পুণ্যফলে তোমাকে দেখিয়া সুখিনী হইব; মুরলা, রত্নমালা, নবীনকালী প্রভৃতি ভগিনীগণের সংবাদ লইয়া সুখিনী হইব; তুমি বালক, আমাদিগের, অনেক তপস্যার ধন, তোমার গুণে আজি কয়েক দিন হইল, আমি যে রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা তোমার কোমলকরে অর্পণ করিয়া আনন্দে ভাসিব, এ-রত্ন দেব-দুর্লভ, হৃদয়ভূষণ, মস্তক-মণি, বহুপুণ্য না থাকিলে এধনে ধনী হওয়া যায় না। বাপ নগেন্! এ-রত্ন, তোমার জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির ফল-পরিচায়ক, এ-রত্ন, তোমার রাজলক্ষ্মী; এ-রত্ন, তোমার হৃদয়-ভূষণ, এ-রত্ন তোমার সেই সরোবরকূলের সারবস্তু, এ-রত্ন, তোমার, সেই সরোবরের নববিকসিত মনোহারিণী কনক-নলিনী; বাপ নগেন্! এখনও কি তোমার বুঝিতে বাকী আছে। এখনও কি নাম শুনিতে ইচ্ছা কর? তবে শোন এ-রত্ন, ইন্দুবালা; সতীকুল গৌরব পালিকা, নারীকুলের শিরোমণি; আমি এ-রত্ন; রাজ-পথে,—তোমার পথে কুড়াইয়া পাইয়াছি। শীঘ্র আসিবে, আমি যাহার রত্ন তাহাকে দিয়া সুস্থ হইব। ইন্দুবালা রমণী-রত্ন, আসিলে সকল কহিব—আপাততঃ ইন্দুর এই কবিতাটী পাঠ কর;

আমি অভাগিনী, পতি বিরহিণী,—

ইত্যাদি পাঠ করিয়া-দাসদাসী উৎকৃষ্ট সহস্রেক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে সত্বর, দাক্ষায়ণী তীর্থে আমার নিকট আগমন কর"।

পত্রপাঠে নগেন্দ্র সপ্তস্বর্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শশী-মুখী ইন্দুবালাকে লাভ করিবেন এই আহ্লাদে সুখসমুদ্রে ভাসমান হইলেন। আবার সরোজবাসিনীর চরণ যুগলের দর্শন পাইবেন, এই আনন্দে রোদন করিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ দাসদাসী সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া কার্য্যান্তর ব্যপদেশে দাক্ষায়ণী তীর্থে গমন করিলেন। লজ্জা প্রযুক্ত মাতা নবীনকালীকে ও শ্যামাকে এসংবাদ প্রদান করিলেন না। কেবল মাধবীকে কহিয়া প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। গমনকালে—ভাবিলেন চরণে ধরিয়া মাতৃ-কল্পা সরোজবাসিনীকে আনয়ন করিবেন। এবার আর পলাইতে দিবেন না। তিনি আসিলেই জননীর সকল দুঃখ দূর হইবে।

যে দিন সরোজবাসিনী ইন্দুবালাকে লইয়া দেবীপূজায় নিযুক্ত আছেন। সেই দিন যুবরাজ নগেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেবীপদে প্রণাম করিয়া সরোজবাসিনীর চরণতলে পতিত হইলেন। সরোজবাসিনী নগেন্দ্রকে উঠাইয়া সাদরে শিরশ্চুম্বন করিলেন এবং কহিলেন, বাপ নগেন্! প্রাণাধিক নগেন্! রত্নমালার নয়নমণি নগেন্! আরবার যে তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করিব সে আশা করি নাই। কিন্তু এই জগজ্জননী আজি সে আশা পরিপূর্ণ করিলেন। বাপ আমার! একবার দেবী সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। নগেন্দ্র দণ্ডায়-মান হইলেন। সরোজবাসিনী ইন্দুবালার দক্ষিণ হস্ত, নগেন্দ্রের দক্ষিণ হস্তের উপর স্থাপন করিয়া পুষ্পমাল্যে বন্ধন পূর্ব্বক রাজবালার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন। মুখশোভায় মন্দির আলোকিত হইল। সরোজবাসিনীর আজ্ঞাক্রমে উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া, উভয়েই লজ্জায় বদন ঈষৎ অবনত করিলেন। সরোজবাসিনী কহিলেন, নগেন্ আজি আমি দেবী সাক্ষাতে তোমাদের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। ভগবতী তোমাদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়া নিরন্তর বিশুদ্ধ প্রেমে পুলকিত রাখুন। তুমি ক্ষত্রিয়প্রধান মহারাজ হংসকেতু পুত্র নগেন্,

আমাদের আদরের ধন, তোমারা সুখী হইলেই আমি সুখিনী ; বাপ! ইন্দুবালা রমণীরত্ন, সতীপতিব্রতা, আমি ইহাকে যেরূপে পাইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর এই বলিয়া সবিশেষ সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। এই শুভঘটনায় তীর্থস্থানে আনন্দস্রোতঃ বহিতে লাগিল। দানে দীন দরিদ্র, অদরিদ্র হইল। সকলেই নানাবিধ উৎসবে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে কমলাকান্ত ধারানগরে সরোজবাসিনীর দর্শন না পাইয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে সরোজের অনুসন্ধান করিতে করিতে দৈব-যোগে ইন্দুবালার বিবাহ দিনে দাক্ষায়ণী তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তীর্থস্থ ব্যক্তি মাত্রকেই আনন্দে মগ্ন দেখিলেন এবং বহুসৈন্যেরও সমাবেশ দর্শন করিলেন, দেখিয়া এক ভদ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধো! এস্থানে অদ্য এত সমারোহ কিসের? দর্শক উত্তর করিল ; মহারাজ হংসকেতু-পুত্র যুবরাজ নগেন্দ্র আসিয়াছেন। সন্ন্যা-সিনী সরোজবাসিনী, তাঁহার বিবাহ দিতেছেন। কমলাকান্ত কহিলেন সরোজবাসিনী—কে? এবং তাঁহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? আপনি কি কিছু বলিতে পারেন? দর্শক কহিল মহাশয়! আমি শুনিয়াছি, যুবরাজ-জননী মহারাণী রত্নমালার সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সরোজ-বাসিনীর স্বামী ব্রাহ্মণাধম কমলাকান্ত ; তিনি বিবাহের পর এই সতী-পতিব্রতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য সরোজবাসিনী, সন্ন্যাসিনীর বেশে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন! হায়! সেই দারত্যাগী দুরাচার কমলাকান্তের ন্যায় হতভাগ্য জগতে অতি বিরল ; এই বলিতে বলিতে দর্শক চলিয়া গেল। কমলাকান্ত বহুদিনের পর সরোজবাসিনীর অনু-সন্ধান পাইয়া বেগে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সরোজবাসিনীর চরণ তলে পতিত হইয়া বাহুযুগলে চরণ যুগল দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

দেশে দেশে বনে বনে ভ্রমি বহুদিন।
আজি কি পাইনু দেখা বদন-নলিন॥

দুরাচার পতি যদি গুরু দোষ করে।
সতী নারী তাহে কভু দোষ নাহি ধরে॥
কমলাকান্তের প্রাণ রাখ এ-বিপদে।
ক্ষম অপরাধ প্রিয়ে! ধরি দুটি পদে॥

সরোজবাসিনী, সহসোপস্থিত সন্ন্যাসী বেশী কমলাকান্তকে দর্শন করিয়া, সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। পতির সকল অপরাধ বিস্মৃত হইলেন। বাহুবল্লরী দ্বারা কমলাকান্তের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া তুলিলেন। মনে মনে চরণ যুগলে কতশত প্রণাম করিলেন এবং মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া আনন্দ-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে গেল। তৎপরে সরোজবাসিনী কহিলেন, আপনি কাহাকে প্রিয়ে! বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? আমি যে আপনার স্ত্রী একথা আপনাকে কে বলিল? আপনার স্ত্রী সন্ন্যাসিনী হইলেন কেন? কমলাকান্ত কহিলেন—

পরনারী গামী, দুরাচার আমি,
না বুঝে তোমার মর্ম্ম।
অধর্ম্মেতে মজি, তোমা ধনে ত্যজি,
ক'রেছি অধর্ম্ম কর্ম্ম॥
হানি বাক্যবাণ, পোড়ায়েছি প্রাণ,
লেখনী সহায় করি।
ক্ষম হে মানিনি! সরোজবাসিনি!
চরণ-যুগলে ধরি।
তুমি সে সরোজ, হৃদয়-সরোজ,
প্রফুল্লকারিণী ধনী।
তুমি সন্ন্যাসিনী, সরোজবাসিনী,
হও নারীশিরোমণি॥

সেই মুখ শশী, সেই মিষ্ট হাসি,
সেই সে বচনে সুধা।
সেই চক্ষু নাসা; সেই মিষ্ট ভাষা—
শ্রবণে নাশিছে ক্ষুধা॥

প্রিয়ে! তুমি এই দুরাচারের, এই নরাধমের, এই হতভাগ্য কমলাকান্তের বাক্যবাণে সংসার পরিত্যাগ করিয়াছ, এ-দুঃখ রাখিতে আমার স্থান নাই। প্রিয়তমে! তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়াছ বলিয়াই আমি সন্ন্যাসী, তুমি ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছ বলিয়াই আমি উদাসীন; তুমি বারাণসী শাটী পরিত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই আমি গৈরিকবস্ত্র ধারী; আমার যে হস্ত, দুর্বাক্য লিখিয়া তোমার অবমাননা করিয়াছে, আজি সেই হস্ত, তোমার চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, প্রসন্ন হইয়া আমাকে রক্ষা কর। গৃহে চল, কমলাকান্তকে বাঁচাও; প্রিয়ে! আমি তোমার অভাবে বহুদিন হইল ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, এই দেখ আমার অস্থিচর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট আছে। কেবল তো মার নাম স্মরণ করিয়াই জীবিত আছি। আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। আমায় ক্ষমা কর। পতির বিলাপ শ্রবণে এবং দেহ দর্শনে সরোজ এইবার বিচলিত হইলেন, আর মনকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। সহসা রোদন করিয়া ফেলিলেন। আজ বিষয়-সুখ বিমুখী সন্ন্যাসিনীর চক্ষে জল আসিল। কমল গৈরিক মৃত্তিকাক্ত বসন দ্বারা সরোজের নয়ন-জল মুছাইলেন।

সরোজ কহিলেন আর কেন! মনে করুন আপনার সরোজের নাম এ-পৃথিবী হইতে লোপ হইয়াছে, আর কেন! যাহাকে বহুদিন বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহাকে আর কেন! সরোজ কিম্বা সরোজের এই বাম করস্থ লৌহ আপনাকে বিস্মৃত হয় নাই। সরোজ কেবল চরণ দর্শন ভিখারিণী; যাহা বাসনা ছিল তাহা ত অদ্য সফল হইল আর কেন! নগেন্দ্র এবং ইন্দুবালা এতক্ষণ করযোড়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। একক্ষণে নগেন্দ্র কহিলেন, জননি সরোজবাসিনি! অন্ততঃ এ-

আশ্রিত নগেন্দ্রের প্রতি, মদীয় জননীর প্রতি, পূজ্যতমা মুরলার প্রতি দয়া করিয়া আপনি গৃহবাসিনী হউন। কমলাকান্ত কহিলেন, প্রিয়ে! আর আমি তোমার কোন কথা শ্রবণ করিব না, আমি, অদ্য হয় তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গৃহে লইয়া যাইব নয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব; আর কেন! আমার জীবন ওষ্ঠাগত হইয়াছে, আমায় রক্ষা কর। সরোজবাসিনী পতির তাদৃশী দশা দর্শনে ভীত হইলেন এবং কহিলেন আর আমার আপত্তি নাই। আমি আপনার অঙ্কবাসিনী হইব। স্বামিন্! আপনার এই সেই শেষ পত্র; গ্রহণ করুন এই বলিয়া অঞ্চল হইতে পত্রখানি উন্মুক্ত করিয়া প্রদান করিলেন। কমল, গ্রহণ করিয়া কটিতে রাখিলেন। পরে সরোজ কহিলেন—মনে বড় সাধ আছে, শ্রীচরণের পূজা করিব, দয়া করিয়া একবার স্থির হইলে পূজা করি, এই বলিয়া স্বামীর পূজায় বসিলেন। মনের সাধে মুক্তিপ্রদ চরণ যুগলের মনের মত পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন। চরণ ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন। আরবার প্রণাম করিলেন। আবার হস্ত প্রক্ষালন করিয়া দেবী পূজা করিলেন। পশ্চাৎ উত্থিত হইয়া নগেন্দ্রের শিরশ্চুম্বন করিলেন। ইন্দুবালার মুখ কমলে চুম্ব দিলেন এবং কহিলেন নগেন্দ্রকে দক্ষিণে রাখিয়া দণ্ডায়মানা হও। ইন্দুবালা তাহাই হইলেন। পরে কমলাকান্তকে কহিলেন, স্বামিন্! দেবীকে বামভাগে রাখিয়া পীঠাসনে উপবিষ্ট হউন—আমি একবার অঙ্কে বসিয়া জীবন সার্থক করি। কমলাকান্ত সেই রূপেই বসিলেন। সরোজবাসিনী ধরাতলে পদদ্বয় রাখিয়া কমলাকান্তের অঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন। এবং বাহুবল্লী দ্বারা স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া মনের সুখে মুখচন্দ্র পান করিতে লাগিলেন। কমলও সরোজের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই বোধ হইল যেন মন্দিরে দেবগণ আগমন করিয়াছেন। স্বর্গীয় মধুর বাজনা বাজিতেছে। অপ্সরাগণ নাচিতেছে। স্বর্গীয় গীত ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত এবং সৌগন্ধে দেবী গৃহ সুগন্ধিত হইতেছে। দেবী

মুর্ত্তি যেন হাসিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে ; দশদিক্ যেন সুপ্রসন্ন হইয়া আনন্দ এবং ভয়প্রদ হইতেছে। এই সময়েই পতি মুখ দর্শন করিতে করিতে সরোজবাসিনীর হস্তদ্বয় বন্ধন উন্মুক্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং নয়নযুগল স্থির হইল। কমলাকান্ত সভয় মনে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন। আর কি সরোজ আছে যে উত্তর দিবে ; কমল নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন সরোজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কমল করুণস্বরে হা! প্রিয়ে সরোজবাসিনি! তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাও এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নগেন্দ্র চকিত নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন।

কমলাকান্ত। দারত্যাগী দুরাচার নরাধম শিরে।
পড়ুক সহস্র বজ্র গভীর গর্জ্জনে॥
শত খণ্ড ক'রে দেক্ এ-পাপ শরীরে।
এড়াই হৃদয় জ্বালা সুখের মরণে।

বলিয়া সজোরে বক্ষে করাঘাত করত হতচেতন হইলেন। নগেন্দ্র বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দেবীগৃহের পার্শ্বেই সরোজের অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন এবং তাহার উপর এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্মশানোপরি স্বর্ণবেদি প্রস্তুত করাইলেন। বেদির উপরে দুইটি পদ্মাসন স্থাপন করিলেন। পরে সরোজের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বহুমূল্য হীরকহার প্রদান পূর্ব্বক সেই আসনোপরি স্থাপন করিয়া মূর্ত্তির বামপার্শ্বস্থ আসন শূন্য রাখিয়া, বহির্ভাগে মন্দির গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া দিলেন। 'যিনি বর্ত্তমানকালে পতিব্রতাধর্ম্মে সরোজবাসিনীর সমকক্ষ হইবেন তিনিই এ [illegible] হার পুরস্কার পাইবেন এবং তাঁহার জীবনান্ত হইলে আমরা তাঁহার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া এই শূন্য আসনে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সরোজবাসিনীর সঙ্গিনী করিয়া দিব।' [illegible] নগেন্দ্র এই শোকাবহ সংবাদ হিমপুরীতে, বিজয়পুরে, ধারানগরে বিরাজ-রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। নগেন্দ্রের পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় বন্ধুগণ

আগমন করিয়া মূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক যথাকালে কিরাতরাজ্যে গমন করিলেন। কেবল কমলাকান্ত সেই তীর্থে দেহ-ক্ষয় জন্য অবস্থান করিলেন।

সম্পূর্ণ।

কনক—নলিনী।

সূচনা।

সকলে কিরাতরাজ্যে উপস্থিত হইয়া নববধূকে লইয়া কয়েক দিন উৎসবে অতিবাহিত করিলেন। এক দিন ইন্দুবালা, শ্বশ্রূদেবীগণ ও অন্যান্য গুরুপত্নীগণকে একত্রে আসীনা হইয়া কথোপকথনে নিমগ্ন দেখিয়া নিকটে আগমন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন। পরমারাধ্য দেবিগণ! স্বর্গীয় সরোজবাসিনী দেবী, শ্বশ্রূদেবীগণকে "কনক-নলিনীর" উপাখ্যান শ্রবণ করাইতে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন। আমি সেই উপাখ্যান আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। অধিক কি গ্রন্থকার যেরূপ লিখিয়াছেন এবং সরোজবাসিনী আমায় যেরূপ শ্রবণ করাইয়াছেন, তাহা আমার অবিকল কণ্ঠস্থ আছে। আপনাদিগের অনুমতি হইলে, তাহা কীর্ত্তন করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে বিমুক্ত হই। মুরলা এবং রত্নমালা কহিলেন, প্রিয়তমে! আমরা সরোজের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম "কনক নলিনী" রমণীগণকে পতিব্রতাধর্ম্ম শিক্ষা দিতে বিশেষ পারদর্শিনী; যদি সেই মনোহর উপাখ্যান আয়ত্ত করিয়া থাক, তবে তাহা শ্রবণ করাইয়া আমাদের আশালতাকে ফলবতী কর। আর বিলম্বে আবশ্যক নাই। এই সময়ে ইন্দুবালার সমবয়স্কা কয়েকটি সঙ্গিনী আসিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। ইন্দুবালা কনকনলিনীর উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন, সকলে একতান-মনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইন্দুবালা কহিলেন, উপাখ্যানের প্রথমেই এইরূপ সূত্রপাত আছে যথা,—